সমস্যায় আক্রান্ত

আধুনিক পশ্চিমা দর্শন



ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

আলী সেন্টার, সুবিদবাজার, সিলেট, বাংলাদেশ।

সমস্যায় আক্রান্ত

আধুনিক পশ্চিমা দর্শন

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

KAA Publication

খানকায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

সুবিদ বাজার, সিলেট।

সমস্যায় আক্রান্ত
আধুনিক পশ্চিমা দর্শন

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

ইন্টারনেট সংস্করণ

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া
গবেষণা বিভাগ
আলী সেন্টার, সিলেট, বাংলাদেশ।
engineerazizulbari@gmail.com

বিষয়সূচি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

দর্শন শব্দটি ইংরেজি philosophy শব্দের বঙ্গানুবাদ। শব্দটির উৎপত্তি গ্রীক ভাষার দু'টি শব্দ থেকেঃ 'philo' এবং 'sofia'। এর অর্থ 'জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা'। তবে আজকের পশ্চিম এবং প্রাচ্যে ফিলোসফি শব্দের অর্থ আরো প্রশস্ত, ব্যাপক। মানবজীবনের মৌলিক দিক যেমন জীবন, মৃত্যু, অস্তিত্ব, বাস্তবতা, সত্য ইত্যাদি সম্পর্কে গভীর জ্ঞানান্বেষা এখন দর্শনের আওতাভুক্ত। কোনো বিশেষ জ্ঞানতাপস বা চিন্তাশীল দলের থিওরী-বিশ্বাস, জীবনবোধ, মূল্যবোধ, সৃষ্টিশীলতা ইত্যাদিও দর্শন শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়ে থাকে। তবে একাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে দর্শনের সঠিক সংজ্ঞা প্রদান বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি, আজকাল নতুন এক দর্শনের জন্ম নিয়েছে, যাকে বলা হয় 'দর্শন কি জিনিষ' তা জানার দর্শন- অর্থাৎ দর্শনের দর্শন!

পশ্চিমে 'এ্যানালিটিক' [analytic] ও 'কন্টিনেন্টাল' [continental] এ দু'টো প্রশস্ত অর্থবোধক ঐতিহ্যগত শব্দ দর্শনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। প্রথমটিকে বলা যায় লজিক [যুক্তিবিদ্যা] এর উপর নির্ভরশীল গবেষণা দ্বারা প্রমাণ-প্রতিপাদ্য সৃষ্টির উপায়-অবলম্বন। আর শেষোক্ত ঐতিহ্যের বিশেষত্ব হলো গবেষণার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত মুভমেন্ট যেমন অস্বিত্ববাদ (existentialism), গুপ্তার্থবাদ (deconstuctivism), ইন্দ্রিয়লব্ধজ্ঞানবাদ (phenomenology) এবং অস্তিত্ব-অধিবিদ্যা (ontology) ইত্যাদির সম্পৃক্ততা। প্রাচ্যের দর্শনকে পশ্চিমা দর্শন থেকে কিছুটা আলাদা করে দেখা হয়। এ গ্রন্থে আমরা প্রাচ্যের দর্শনের উপর কোন আলোচনা করবো না।

দর্শনের বিয়ষ-আসয়

দর্শনের মূল বিষয় ক'টি ও কি কি- এ প্রশ্নের সঠিক জবাব দেওয়া কঠিন। তবে পশ্চিমা অধিকাংশ গবেষক চারটি মৌলিক বিষয়কে এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এগুলো হলোঃ

১. অধিবিদ্যা [metaphysics]।
২. জ্ঞানবাদ [epistemology]।
৩. চরিত্রদর্শন [ethics]।
৪. যুক্তিবিদ্যা [logic]।

মেটাফিজিক্স বা অধিবিদ্যা এবং অন্টোলজি বা অস্তিত্ব-অধিবিদ্যা সামর্থবোধক। শাব্দিক অর্থ "পদার্থবিদ্যার ঊর্ধ্বে"। অস্তিত্ব ও বাস্তবতার স্বরূপ এই দর্শনের গবেষণার আওতাভুক্ত বিষয়াদি। বিশেষ করে অদৃশ্য অথচ অনুভূতিলব্ধ জগৎ, প্রভু, আত্মা ও স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ের উপর গভীর দার্শনিক গবেষণা মেটাফিজিক্সের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়। কোন কোন সময় অধিবিদ্যাকে আরো প্রশস্ত করেও দেখা হয়। ডলান্ড পালমার তার 'লুকিং এট ফিলোসফি' [looking at philosophy] গ্রন্থে অধিবিদ্যার সংজ্ঞা দিতে যেয়ে বলেন, "the branch of philosophy that attempts to construct a general, speculative worldview; a complete, systematic account of all reality and experience, usually involving an epistemology, an ontology, an ethics, and an aesthetics." [পৃ. ৪১০]।

উপরের সংজ্ঞা থেকে এটা স্পষ্ট অধিবিদ্যার একটি শাখার নাম **জ্ঞানবাদ** [epistemology]। কিন্তু অধিকাংশ দার্শনিক এই শাখাটিকে দর্শনের একটি একক আলাদা মূল শাখা বলেছেন। জ্ঞানের সূত্র, প্রকার,

ব্যাপ্তি, সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি এই জ্ঞানবাদী গবেষণার আওতাভুক্ত। আধুনিক যুগে জ্ঞানবাদে জ্ঞানকে সংজ্ঞায়িত করা হয়, একটি উক্তি যা হয় সত্য না হয় মিথ্যা। অর্থাৎ জ্ঞানবাদ এখন 'লজিক' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

মানবিক ক্ষেত্রে দর্শনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলে **চরিত্রদর্শন**। এই বিষয়টি আপামর জনতার উপর ইতিহাসব্যাপী সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করে আসছে। একে নৈতিক দর্শনও বলে। দার্শনিকরা গভীর গবেষণা করে সিদ্ধান্ত নেন জীবনচলার পথে আমাদের জন্য কোন্‌টি সঠিক ও সত্য এবং কোন্‌টি অঠিক ও মিথ্যা। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে এই দর্শন প্রাকটিকেল ক্ষেত্রে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এথিক্স [ethics] বা চরিত্রদর্শনের ক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি সমগ্র সমাজকে দিগভ্রান্ত করতে পারে। অন্যদিকে সঠিক নীতি-নৈতিকতার উপর ভিত্তি করে গড়েওঠা এই দর্শন মানুষের জীবনকে করতে পারে সফল, শন্তিময়, উন্নয়নশীল ও বিশ্বাসীদেরকে দান করতে পারে দুনিয়া-আখিরাতে স্বার্থকতার নিশ্চয়তা। সুতরাং এই দর্শনকে নিয়ে অত্র গ্রন্থে অধিক আলোচনা হবে।

পশ্চিমা চরিত্রদর্শনে অনেক ভালো, মানবতার জন্য উপকারী এবং ধর্মদর্শনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এমন কিছু থিওরীবলীর উপর আমরা আলোচনা করবো। সেসাথে আমাদের বিশ্বাস, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বা অসামঞ্জস্যশীল দার্শনিক থিওরী ও ধারণার উপর সমালোচনামূলক কথা এ বইটিতে থাকবে। যে কোন লেখায় ব্যক্তি পর্যায়ের মতামত তো থাকেই- আর দর্শনের ক্ষেত্রে তা-তো আরো বেশী স্বাভাবিক। সুতরাং পাঠকদের প্রতি অনুরোধ- কোন এক বা একাধিক বিষয়ে আপনার দ্বিমত থাকতে পারে। আপনি আমার মতামত অন্তত বিবেচনার দৃষ্টিতে পাঠ করবেন- এটুকু আবদার রইলো।

আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে এথিক্সকে তিনটি সাধারণ উপশাখায় বিভক্ত করে দেখা হয়: মেটাএথিক্স [metaethics], নরমেটিভ এথিক্স [normative ethics] এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্ববহ এ্যাপ্লাইড এথিক্স [applied ethics]।

মেটাএথিক্স একটি আধুনিক ধারণা। এর কাজ আমাদের নীতি-নৈতিকতার সূত্র এবং ব্যাখ্যা নিয়ে গবেষণা করা। এসব আদর্শ কী মূলত 'সামাজিক আবিষ্কার' মাত্র? এগুলো কী ব্যক্তি অনুভূতির থেকেও অধিক মৌল? এসব প্রশ্নের মেটাএথিক্যাল জবাব সার্বজনীন সত্য, প্রভুর ইচ্ছা, এথিক্যাল বিচার-বিবেচনায় যুক্তিদিব্যার ব্যবহার ও কার্যকারিতা এবং ব্যবহৃত স্বয়ং এথিক্যাল শব্দাবলীর সঠিক ব্যাখ্যা ইত্যাদির উপর নিবদ্ধ থাকে।

নরমেটিভ এথিক্স যার বঙ্গানুবাদ হতে পারে 'সাধারণ চরিত্রদর্শন', এর কাজ হলো বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যবহারোপোযোগী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণা। নীতি-নৈতিকতার মোরাল স্টেন্ডার্ড [moral standard] সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত আছেন নরমেটিভ এথিক্সের গবেষকরা। সুতরাং তাদের এসব কথা ও নির্দেশ সকলের জন্য উপকারী হতে পারে। এর অর্থ নয় যে, সাধারণ্য মৌলিক নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কে একেবারে অনভিজ্ঞ বা অজ্ঞাত। মানুষ স্বভাবতই ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। এরপরও চরিত্রদর্শনের প্রবক্তারা আমাদের জন্য একগুচ্ছ নীতি ও নৈতিকতার দিক থেকে উত্তম কর্ম এবং এর দুনিয়াবী উপকার সম্পর্কে অতিরিক্ত সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। যা অনুসরণ করলে আমাদের জীবন হতে পারে সফল, সুখের, শান্তির ও উন্নততর। সুতরাং নরমেটিভ এথিক্স সুন্দর জীবন গঠনের জন্য কোন্ কোন্ কাজ করণীয় ও কোন্ কোন্‌টি বর্জনীয় তার উপর গভীর গবেষণা করে থাকে।

এথিক্সের চতুর্থ শাখার নাম ব্যবহারিক এথিক্স [applied ethics]। উপরোক্ত নরমেটিভ এথিক্সেরই এটা ঊর্ধ্বতম স্তর মাত্র। যেখানে নরমেটিভ এথিক্স সর্বসাধারণের জন্য উপকারী চারিত্রিক গুণাবলীর আইন-কানুন আমাদেরকে উপহার দেয়, সেখানে ব্যবহারিক এথিক্স সচরারচ ব্যবহৃত [এবং ব্যবহার হওয়া উচিৎ] বিষয় আসয় নিয়ে গবেষণা করে। আধুনিক যুগে একটার পর আরেকটা ইস্যুর সম্মুখীন হচ্ছে পুরো মানবজাতি যার সঠিক নীতি-নৈতিকতাসম্পন্ন সমাধান খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন বলে প্রমাণিত হচ্ছে। অথচ এসব ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে পুরো সমাজের ভবিষ্যৎ নৈতিক দিকনির্দেশনা। পুরো বিশ্বসমাজ আজ যেসব ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হিমশিম খাচ্ছে তার ক'টি হলো: গর্ভপাতন [abortion], শিশু প্রতিপালন [child care], মানব ক্লোনিং [human cloning], দেহযন্ত্র অনুদান [organ donor], স্বেচ্ছামৃত্যুবরণ [euthanasia], ব্রেন ট্রান্সপ্লান্ট [brain transplant], ডিজাইনার বেবী [designer baby], জন্তুধিকার [animal rights], পারিপার্শ্বিকতা [environment], সমকামিতা [homosexuality], বিবাহ সমস্যা [marriage problems], মৃত্যুদণ্ড [capital punishment], মানবাধিকার [human rights] এবং পারমাণবিক যুদ্ধ [nuclear war]। এসব ব্যাপার নিয়ে বর্তমানে পুরো বিশ্বব্যাপী এবং বিশেষকরে পাশ্চাত্য দুনিয়ায় দার্শনিক, সমাজ সচেতন ব্যক্তি, শাসকগোষ্ঠি, সাধারণ জনতা ইত্যাদি সকল গ্রুপ ও চিন্তাবিদরা গরম গরম সংলাপে জড়িত হয়েছেন। কিন্তু আজো উপরোক্ত প্রতিটি বিষয়ে 'সঠিক' সিদ্ধান্তে কেউ পৌঁছেন নি বা দেন নি। অবশ্য দাবীদারদের অভাব নেই। আমরা চরিত্র দর্শনের উপর আলোচনাকালে উপরোক্ত এক দু'টো বিষয় নিয়ে পশ্চিমা দার্শনিকদের চিন্তা-চেতনার দিকনির্দেশনা তুলে ধরবো।

দর্শনের চতুর্থ বড় বিষয়টি হলো **যুক্তিবিদ্যা** [logic]। দর্শন বিষয়ক কোন থিওরী বা প্রতিপাদ্য লজিক দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়। ভাষার যুক্তি দ্বারা যে কোন থিওরীর উপমা খাড়া করে শেষ উপসংহারে পৌঁছুতে হবে। লজিক হলো তর্ক [argument], প্রতিজ্ঞা [premise] এবং উপসংহারের [conclusion] মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা। লজিক দুই ধরনের: ১. অবরোহী তর্ক [deductive argument] এবং ২. আরোহী তর্ক [inductive argument]। প্রথমটির অর্থ, প্রতিজ্ঞা ও উপসংহারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্ত সম্পর্ক বলে প্রমাণ উপস্থাপন। কোনো যৌক্তিক আরোহী তর্ক দ্বারা যে ফলাফল বা উপসংহারে পৌঁছা যায় তা ভুল হবে না যদি প্রতিজ্ঞাসমূহ সত্য হয়। আর দ্বিতীয়টির অর্থ, প্রতিজ্ঞা ও ফলাফলের মধ্যে সম্পর্ক বা লিংক অনেকটা দুর্বল। লজিক্যালী সঠিক ইন্ডাক্টিভ তর্ক থেকে আমরা যে ফলাফল লাভ করবো তা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে যদিও তা ভুল হতেও পারে।

দর্শনে লজিকের স্থান অতি গুরুত্ববহ। অত্র গ্রন্থে আমরা এ সম্পর্কে কিছু হৃদয়াকর্ষক আধুনিক পশ্চিমা থিওরীর উপর আলোচনা করবো। তবে খুব একটা গভীরে যাবোও না। দর্শনের উপর এই গ্রন্থ রচনা মূলত ভূমিকাসর্বস্ব। এখানে বেশী গভীরে যেয়ে কঠিন এ বিষয়টির উপর সাধারণ্যের জন্য অনেকটা দুর্বোধ্য ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে বক্তব্যদান উদ্দেশ্য নয়। আধুনিক যুগে পশ্চিমা দর্শন কোন্ দিকে যাচ্ছে- তা-ই হবে আমাদের আলোচনার সীমারেখা। তবে এটাও দাবী করা যাবে না, এখানে সমসাময়িক পশ্চিমা দর্শনের সবটুকু আলোচিত হয়েছে- না, মোটেই না, বরং এ থেকে অনেক দূরে। কারণ, দর্শন এক বিরাট বিষয়। অতি জটিল-কঠিন আজকের মানবজীবন, বিজ্ঞান দ্বারা প্রতিনিয়ত আবিষ্কৃত বস্তুজগতের তথ্যাদি ও স্বরূপ এবং ধর্ম ও দর্শনের দীর্ঘ ইতিহাস-ঐতিহ্য ইত্যাদি সবই নতুন দর্শনকে যোগান দিচ্ছে গবেষণার খোরাক। সুতরাং দর্শনের ব্যাপকতা বিরাট। হয়তো বিষয়ের উপর আরো অতিরিক্ত জানতে আগ্রহী

হবেন এ গ্রন্থ পাঠের কারণে অনেকে। আর এটাই আশা।

জ্ঞানান্বেষার পিপাসা যাদের আছে, তারা তো এমনিতেই আজকের বিজ্ঞান ও দর্শন সম্পর্কে অধিক জানার চেষ্টা করবেন নিঃসন্দেহে। জ্ঞানের পিপাসা নিবারণের পথ অধ্যয়ন ও গবেষণা এবং বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তার দ্বারাই মিটতে পারে। এ ক্ষেত্রে আমার এই চেষ্টাটুকু হয়তো এ পিপাসা নিবারণে কিছুটা সহায়ক হবে।

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী
লন্ডন, ২৬ ডিসেম্বর ১২।

দর্শনের মূল কিছু আধুনিক [পশ্চিমা] ধারণা -২

১. জ্ঞানবাদী [epistemology] সমস্যাবলী

১.ক. ব্রেন ইন এ ভেট! কল্পিত ধারণা: মূল শিরোনাম 'দর্শনের মূল কিছু আধুনিক [পশ্চিমা] ধারণা' বললাম আর শুরু হলো সমস্যা নিয়ে! আপাতত ধরে নিই 'সমস্যা' মানেই দর্শন! যাক, মনে করুন পাগল এক ডাক্তার এক ব্যক্তির মগজ খুলে পাত্রে রাখলো। শুনেছি, বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের মগজ নাকি বিশেষ পানীয় দ্বারা পূর্ণ একটি পাত্রে রাখা হয়েছে, তবে তাঁর মৃত্যুর পরে- সুতরাং এই ডাক্তারকে পাগল বলা উচিৎ হবে না! ঐ ব্যক্তির মগজ পাগল ডাক্তারবাবু যে পাত্রে রেখেছেন, তাতে আছে মস্তিষ্ক জিইয়ে রাখার যাবতীয় রসায়ন বস্তু। নার্ভ তারের মাধ্যমে একটি সুপারকম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত রাখা হলো এই জীবিত ব্রেনকে। কম্পিউটার থেকে প্রতি মুহূর্তে ব্রেনে স্বাভাবিক দুনিয়ার চিত্রসহ সবকিছু 'পাঠানো' হলো মগজে। ফলে মগজ সবকিছু 'স্বাভাবিক' দেখবে। কিন্তু আসলে তো তা কম্পিউটারের তৈরী 'ইলুশন' [কৃত্রিম চিত্র] মাত্র। ব্রেন দেখবে মানুষ, বস্তু, আকাশ ইত্যাদি- যা আমরা সবাই দেখি। কিন্তু ঐ 'ভেটে থাকা ব্রেন' ব্যক্তি তো সবই কম্পিউটারের সৃষ্ট চিত্র দেখছে মাত্র- কিন্তু তা কি সে বুঝতে পারবে? অন্য কথায়, সে কী করে জানবে দৃশ্যমান জগৎ 'বাস্তব' না 'মরীচিকা'?

এখন প্রশ্ন জাগে, দৃশ্যমান এ জগৎ থেকে পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা যে জ্ঞানার্জন করি তা কতটুকু সঠিক? এগুলো বাস্তব সত্য জ্ঞান না মরীচিকা বা অবাস্তব সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ মাত্র? বাইরের জগৎ যেভাবে দেখছি তা কি ঠিক এরূপ? কিছু কিছু দার্শনিক এ ধরনের প্রশ্ন দ্বারা আমাদেরকে বুঝাতে চান, পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত বাইর জগতের জ্ঞান

সত্যিকার অর্থে ইলুশন বা মায়া মাত্র। অন্তত এসব সঠিক হওয়ার ব্যাপারে আমরা পূর্ণাঙ্গভাবে নিশ্চিত হতে পারবো না। এই 'সন্দেহবাদী' [scepticism] দার্শনিক ধারণার জন্ম দিয়েছিলেন ঈসায়ী সতেরো শতকের দার্শনিক রেনি ডেকার্ট (১৫৯৬-১৬৫০)। তিনি লিখেছেন:

"আমি মনে করি ... কোন শক্তিশালী শয়তান তার যাবতীয় ক্ষমতা ও এনার্জি দ্বারা আমাকে ধোঁকা দিচ্ছে। আমি ভাববো আকাশ, বাতাস, মাটি, রঙ, আকার, শব্দ এবং যাবতীয় বাইরের বস্তু তার সৃষ্ট 'স্বপ্ন' মাত্র। সে এগুলো তৈরী করেছে আমার [জ্ঞান সম্পর্কে] 'বিবেককে' নিয়ন্ত্রণ করতে।"

ডেকার এরূপ মন্তব্য 'সবাই' মেনে নিয়েছেন তা কিন্তু নয়। তবে স্কেপটিসিজম [সন্দেহবাদ] নির্মূল হয়ে যায় নি। অন্তত কিছু ব্যাপারে সন্দেহ রাখা গ্রহণযোগ্য বলেছেন অনেকে। এমনকি তা হয়তো ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনতে অনেকটা সহায়ক হতে পারে। আধুনিক যুগে, আপনি কার লেখা কোন্ কিতাব পড়ছেন সে ব্যাপারে সতর্ক থাকাবেন নিশ্চয়ই। অন্যথায় খুব সহজেই সেই লেখা থেকে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়তে পারেন- এমনকি লেখকের ইচ্ছানুযায়ী তার 'বাতিল' মতবাদকে সঠিক মেনে তার দলের একজন কর্মী হয়ে যেতে পারেন। দৃষ্টান্ত: মওদুদীবাদ, আহলে হাদীস, মুক্তমনা, চরম যুক্তিবাদ, সালাফিবাদ ইত্যাদি। তাই সন্দেহবাদী ধারণা একেবারেই অমূলক মনে করতে নেই- এ থেকে কিছুটা ইতিবাচক ফলাফল আসতে পারে।

চিন্তাখাদ্য: আপনি কি ভেটেবন্দী মগজ?

১.খ. প্লেটোর গুহা: কল্পিত ধারণা: মনে করুন আপনি জীবনভর একটি অন্ধকার গুহার কয়েদী। আপনার হাত-পা সম্পূর্ণরূপে অচল। আপনি এদিক-সেদিক তাকাতে অপারগ- শুধুমাত্র সামনের গুহার দেওয়ালটি আপনার চোখে সর্বদা দৃশ্যমান। আপনার পেছনে আছে জ্বলন্ত এক অগ্নিকুণ্ড। আপনি ও অগ্নিকুণ্ডের মধ্যখানে একটি পথ যেখানে রক্ষিত আছে একাধিক মূর্তি ও বিভিন্ন বস্তু। অগ্নিকুণ্ডের আলো থেকে সৃষ্ট ওসব বস্তুর "ছায়া" সামনের দেওয়ালে পড়েছে। আপনি সারা জীবন যা দেখেছেন বা দেখছেন তা এই ছায়া মাত্র। আপনি ও আপনার মতো অন্যান্য কয়েদীরা শুধুমাত্র এই "ছায়াময়" বস্তুর কথা নিয়ে আলাপ-আলোচনা ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

এখন, মনে করুন আপনাকে অবশেষে মুক্ত করা হলো। আপনি এবার পুরো গুহার ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছেন ও বিভিন্ন বস্তু দেখতে লাগলেন। অগ্নিকুণ্ড দেখে প্রথমেই অবাক! এটা কী? আপনি অনেক ভেবে-চিন্তে এ সম্পর্কে জানলেন- জ্ঞানর্জন করলেন। এরপর অন্যান্য বস্তু- মূর্তি, পথ, বিভিন্ন বস্তু। আপনি এগুলো কী তা-ও ধারণা করলেন- চিনলেন। আপনি এখন বুঝতে পেরেছেন ওসব ছায়া যেগুলো আপনার নিকট তখন বাস্তব বস্তু মনে হয়েছিল- ওগুলো মূলত আসল মূর্তি থেকে সৃষ্ট।

আপনাকে এবার গুহার বাইরে আসতে দেওয়া হলো। আপনি সম্পূর্ণ মুক্ত! কিন্তু আপনার চোখে অসংখ্য এসব কী বস্তু দেখাচ্ছে। বিশাল আকাশ, প্রশস্ত জমিন, উজ্জ্বলভাবে-আলোকিত প্রকাণ্ড এক সূর্য কর্তৃক? আর ঐ বৃক্ষরাজি! পুষ্পোদ্যান! মহাসাগর! আরো কত কিছু। আপনি এসব বস্তু কী তা জেনে নিলেন।

প্লেটোর গুহার ব্যাখ্যাঃ দার্শনিক প্লেটো [খ্রি.পূ. ৪২৮- ৩৪৭] তার ‘রিপাবলিক‘ গ্রন্থের ৭ম খণ্ডে ‘Allegory of Cave’ নামক একটি পরিচ্ছেদ যুক্ত করেছেন। এতে উক্তরূপ বর্ণনা আছে। এই গল্প থেকে জ্ঞানবাদের মূল একটি শাখা ‘ভাববাদ’ এর জন্ম [Idealism or Forms]। উক্ত গুহার অর্থ হলো ‘চেতনশীল হওয়ার ক্ষেত্র’। আমাদের দৃশ্যমান জগৎ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্র। এ জগতের সবকিছু প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। সুতরাং দৃশ্যমান জগৎ flawed বা ভ্রম। বাধাবস্থায় থাকা কয়েদীর অর্থ হলো সাধারণ মানুষ যারা এক conjecture ও illusion-সর্বস্ব পৃথিবীতে বাস করে। অপরদিকে যারা গুহার ভেতর মুক্ত তাদের দ্বারা বুঝানো হয়েছে, ওসব মানুষ যারা নিজের পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে যেটুকু সম্ভব জ্ঞানার্জন করে থাকে। আর যারা মুক্ত হয়ে বাইরে অবস্থান করে তাদের দ্বারা বুঝানো হয়েছে, ‘পূর্ণ চেতনশীল হওয়ার ক্ষেত্র’। এই ক্ষেত্র হলো, বুদ্ধিদীপ্ত সত্য-জগৎ যেথায় বিদ্যমান আছে জ্ঞানের বস্তুসমগ্র, যারা perfect, চিরন্তন এবং অপরির্তনশীল। মোটকথা, এই দৃশ্যমান জগতে [উক্ত কেচ্ছায় গুহার অভ্যন্তরস্থ জীবন] কিছুই ideal বা আদর্শ নয়। কারণ আইডিয়াল বা পারফেক্ট জগতের সবকিছু হতে হবে অপরিবর্তনীয়, চিরন্তন।

সুতরাং এই empirical জগতে কিছুই আইডিয়েল নেই, তাই প্লেটোর মতে এমন একটি আইডিয়েল জগত থাকা আবশ্যক। তিনি এই জগতকে Forms বা Ideas বলেছেন। তবে একদল দার্শনিক পরবর্তীতে ভাববাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তারা একে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং জন্ম দিয়েছেন চরম যুক্তিবাদ [rationalism]। কিন্তু আইডিয়েলিজম এর মৃত্যু হয় নি। এখনও এর বিভিন্ন রূপ দর্শনের সংলাপের মূল বিষয়বস্তু।

চিন্তাখাদ্যঃ জাগতিক জ্ঞান ‘ছায়া’ ছাড়া কিছুই নয়। তাহলে জ্ঞান কি? আর জাগতিক জ্ঞান ছায়া হলে তা কিসের ছায়া?

১.গ. অভিজ্ঞতার পর্দা: অর্থ: আমরা এই জগতকে কিভাবে দেখি এবং এর শব্দাবলি শুনি ও বিভিন্ন বস্তুর গন্ধ নেই? অধিকাংশ মানুষ মনে করেন, জগতকে যেভাবে আমরা পর্যবেক্ষণ করি তা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। কিন্তু 'সাধারণ জ্ঞানে উপলব্ধ' এই ধারণা নিয়ে দার্শনিকরা মাথা ঘামাচ্ছেন অনেক দিন যাবৎ। কারো কারো প্রশ্ন, আমরা কি আদৌ বাইরজগতকে সরাসরি পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা রাখি? তারা যে উত্তর খুঁজে পেয়েছেন তাহলো, বাস্তবে শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ 'ধারণা', 'চিত্র' বা আধুনিক ভাষায় 'sense data' [ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যাদি] এর উপর আমাদের সরাসরি অধিকার আছে। ঈসায়ী সতেরো শতকে জন লকে [১৬৩২-১৭০৪] এই ধারণার জন্ম দেন। তিনি বলেন, 'মানবিক বুঝ [understanding] মূলত এরূপ: যেমন একটি বদ্ধ কোঠা। যেখানে কোন আলোকরশ্মি ঢুকতে পারে না। অতি ক্ষুদ্রকায় কিছু পথ খোলা আছে মাত্র। এসব পথ দিয়ে ভেতরে ঢুকতে সমর্থ হয় বাইরের দৃশ্যতঃ প্রতিচ্ছায়া কিংবা বস্তুর ধারণা।' লকের এই দার্শনিক চিন্তা থেকে অভিজ্ঞতার পর্দা বা বাস্তব বাইর জগত ও আমাদের অভ্যন্তরীণ জগতের মাঝখানে পর্দা থাকার ধারণার জন্ম।

যারা এই দর্শনের উপর অটল তারাই সন্দেহবাদী [sceptic]। তাদের মতে কোন বস্তু সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়। তারা বলেন, টমেটো দেখতে লাল বা কালো হতে পারে- সব নির্ভর করে কতটুকু আলোকরশ্মি এর উপর পতিত হয়ে চোখে আসছে। এ ধরণের কথা দ্বারা তারা সবার মনে এ সন্দেহ সৃষ্টি করেন, 'আমাদের আল্লাহ-প্রদত্ত ইন্দ্রিয়সমূহ কাজে লাগিয়ে কখনো সঠিক সত্য আবিষ্কার সম্ভব নয়। অর্থাৎ সত্যিকার জ্ঞানার্জন অসম্ভব।'

কিন্তু এই লকেই আবার বলেন, 'আমরা যাকিছু অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান অর্জন করি বাইর জগৎ সম্পর্কে, তার স্বরূপ দু'টি: ১. প্রাইমারী গুণাবলী

বা প্রাথমিক গুণাবলী ও ২. সেকেন্ডারী বা মাধ্যমিক গুণাবলী।' একথা বুঝতে যেয়ে আমরা উপরোক্ত টমেটো সম্পর্কে চিন্তা করতে পারি। টমেটোর নিজস্ব যে আকার ও আয়তন আছে তা তার প্রাইমারী গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত, ঠিক যেরূপ তার মধ্যে আলাদা 'স্বাদ' আছে। কিন্তু তার রঙ নির্ভর করে আলোকরশ্মি পতনের উপর। আধুনিক বিজ্ঞান বলে, প্রত্যেক বস্তুর বহিরাঙ্গে 'পিগমেন্ট' নামক রসায়নিক বস্তু আছে। বহিরাঙ্গ সেই পিগমেন্ট মুতাবিক আলোকরশ্মির ৭ রঙের যে কোন এক বা একাধিক রঙ প্রতিবিম্ব করে। কোন্ রঙের রশ্মি কী পরিমাণ প্রতিবিম্ব হচ্ছে তা-ই নির্ধারণ করে বস্তুর রঙ। সুতরাং টমেটো থেকে যে রঙ বেশী প্রতিবিম্ব হয় তাহলো লাল। বাকী রঙগুলোর বেশিরভাগ পিগমেন্ট চুষে নেয়- প্রতিবিম্ব তেমনটি করে না। ফলে টমেটো আমাদের চোখে লাল দেখায়। অথচ তার বহিরাঙ্গের পিগমেন্ট এই রঙটিকে অগ্রাহ্য করে বাইরের দিকে ফেরৎ পাঠিয়েছে। এটা তার পছন্দনীয় নয়! কিন্তু এ রঙেই সে আমাদের চোখে ধরা দেয়। এতে বুঝা গেল বস্তুর রঙ মূলত সেকেন্ডারী গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং উভয়কুল রক্ষা করতে লকে এই প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী গুণাবলীর ধারণার জন্ম দিয়েছেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি শক্তিশালী পাল্টা গবেষণা করেছিলেন তিনি হলেন জর্জ বার্কেলী [১৬৮৫-১৭৫৩]। ১৭১০ শতকে তিনি বললেন, 'অস্তিত্বশীল হওয়ার অর্থ দৃশ্যতঃ অভিজ্ঞতা অর্জন' [to exist is to be perceived]। সুতরাং, আমরা যেই মুহূর্তে বস্তুর দিকে তাকানো বন্ধ করবো তখনই আমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে! তিনি এই পরিণতি গ্রহণ করে নিয়েছেন- কারণ, সাহায্য বিদ্যমান- তিনি হচ্ছেন আল্লাহ। তার মতে প্রভুর মনে জগতের সবকিছু সর্বদাই অস্তিত্বশীল, তাই অ-বস্তুর জগতের অস্তিত্বও চিরন্তন। এই থিওরীর নাম 'ভাববাদী থিওরী' [idealist theory]।

চিন্তাখাদ্যঃ বর্ণিত পর্দার অপরপ্রান্তে কী আছে?

১. ঘ. Cogito ergo sum - আমি চিন্তা করছি, তাই আমি **অস্তিত্বশীল:** রেনি ডেকার্ট [১৫৯৬ - ১৬৫০], ফ্রান্সের দার্শনিক-গাণিতিক নিজেকে দর্শনচিন্তার জঙ্গলে হারিয়ে 'মানবিক জ্ঞান' সম্পর্কে কোনো উপায় খুঁজছিলেন যার উপর নির্ভর করা যায়। এরপর ১৬৩৭ ঈসায়ীতে তিনি বললেন, 'আমি একদা চিন্তা করছিলাম, সবকিছু ভ্রান্ত। কিন্তু আমি? আমি কে এসব ভাবছি? এটা তো অনিবার্য যে আমি, যে উক্ত ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা করছি, কোনো একটা কিছু নিশ্চয়ই! সুতরাং এই সত্যকে আবিষ্কার করলাম, "আমি চিন্তা করছি, তাই আমি অস্তিত্বশীল [বা আমি চিন্তাশীল, তা-ই আমি! - I think, therefore I am]"। এটা এতোই বাস্তব ও মহাসত্য যে, সকল সন্দেহবাদী মিলেও একে উড়িয়ে দিতে পারবেন না। সুতরাং যে দর্শনকে আমি খুঁজছিলাম তার প্রথম প্রতিপাদ্য এটাকেই নির্ধারণ করলাম'।

ডেকার্টের এই উক্তি খুব শক্তিশালী। এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, এ জগৎ মোটেই মরীচিকা নয়- বরং বাস্তব। এর প্রমাণ ডেকার্ট [এবং জগতের সবকিছু ও সকলে] নিজেই। অস্তিত্ব সত্য না হলে এ নিয়ে ভাবে কে? তবে এটাও বলতে হবে, **Cogito** -এর ধারণা ডেকার্টের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকলেও এর মূল সূত্র অনেক পুরাতন। বিভিন্ন ধর্মে অনুরূপ ধারণার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন খৃষ্টধর্মের এক চিন্তাশীল মনীষী সেন্ট অগাস্টিন [৩৫৪ - ৪৩০] ঈসায়ী পঞ্চদশ শতকের শুরুতে লিখেছেন, 'আমরা যাকিছু ইচ্ছে তার উপর সন্দেহ করতে পারি, কিন্তু পারি না শুধু নিজের আত্মার নিজস্ব সন্দেহ সম্পর্কে।' অগাস্টিনের এ উক্তির সূত্রও তিনি নিজে ছিলেন না।

বলতে হবে, ডেকার্ট- যাকে পশ্চিমা দার্শনিকরা **'ফাদার অব মডার্ন ফিলোসফি'** হিসাবে মানেন, মূলত সন্দেহবাদকে বেশী জোরদার করেছেন। আমরা দেখেছি কিভাবে তিনি ভেবেছিলেন, সবকিছু শয়তানী স্বপ্ন! উপরে **১.ক-এ** এ ব্যাপারে বিস্তারিত বলেছি। অন্যদিকে এই ডেকার্টই আবার নিজের তৈরী গর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে বলেছেন, **'আমি চিন্তা করছি, তা-ই আমি অস্তিত্বশীল'**।

চিন্তাখাদ্য: আপনার চিন্তার মূলে কী বা কে আছে?

১.ঙ. কারণ ও অভিজ্ঞতাঃ আমরা বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানার্জন কিভাবে করি? 'কারণ'-কে ব্যবহার করেই কী মূলত আমরা জ্ঞান আহরণ করি? নাকি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত 'অভিজ্ঞতা'ই মূলত জগতকে জানার সূত্র? পশ্চিমা জ্ঞানবাদের ইতিহাস এই দু'টি প্রশ্নকে ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে। আমরা জ্ঞানার্জন করি, কার্য-কারণ সূত্রে না অভিজ্ঞতা সূত্রে? আর এ দু'টি বিপরীতমুখী ধারণা থেকেই জন্ম নিয়েছে দর্শনের মূল দু'টি শাখারঃ যুক্তিবাদ [rationalism] ও অভিজ্ঞতাবাদ [empiricism]।

এ ব্যাপারে তিনটি বিপরীতমুখী ধারণা অনুধাবন করা জরুরীঃ ১. a priori vs a posteriori, ২. analytic vs synthetic, এবং ৩. necessary vs contingent। এসব শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ এখানে আপাতত উল্লেখ করছি না। ভাবার্থ বেরিয়ে আসলেই হয়।

১. a priori vs a posteriori: প্রথম শব্দটির অর্থ, এমন কোন বস্তু, বিষয় ইত্যাদি যা পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই জানা যায়। কোন এম্পিরিক্যাল গবেষণা ছাড়া যা বুঝা যায়। যেমনঃ ২+২ = ৪। এই সমীকরণ সত্য- এটা '**এ প্রাইওরি**'। বাইর বিশ্বে যেয়ে তদন্ত পরিচালনা দ্বারা এর সত্যতা প্রমাণের প্রয়োজন নেই। অপরদিকে যদি এরূপ তদন্ত জরুরী হয় তাহলে সেটা হবে '**এ পস্টেরিওরি**'। যেমন এই বাক্যঃ 'কয়লা কালো', যদি এটা সত্য হয়, তাহলে তা '**এ পস্টেরিওরি**' সত্য। এর প্রমাণের জন্য আপনাকে 'কয়লা'র দিকে তাকাতে হবে।

২. analytic vs synthetic: যে কোন প্রপোজিশন 'আনালিটিক' ঐ ক্ষেত্রে যদি এর মধ্যে বর্ণিত কথা থেকে অতিরিক্ত অর্থ বেরিয়ে না আসে। যেমন এই বাক্যের সত্যতাঃ 'সকল কুমার অবিবাহিত', সহজে অনুধাবনযোগ্য, কারণ কুমার ও অবিবাহিত শব্দ অর্থের দিক থেকে

সম্পৃক্ত- আনালিটিক। অপরদিকে যদি বলি, 'সকল কুমার চরিত্রহীন!', তাহলে কথাটি হবে সিনথেটিক। অর্থাৎ এর দ্বারা দু'টি আলাদা ধারণার মিশ্রণ [সিনথেসাইজ] ঘটেছে। এ থেকে যে তথ্য [আর এখানে ভুল-তথ্য] পাওয়া গেলো তা উক্তি বৈ নয়। এটা সত্য কিংবা মিথ্যা হতে পারে। এ ক্ষেত্রে কথাটির সত্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজন জগতের সকল 'কুমারদের' চরিত্র তলিয়ে দেখা!

৩. necessary vs contingent: যে সত্য অন্য কিছু হতে পারে না, সেটাই অনিবার্য বা নেসেসারী সত্য। যে কোন অবস্থা, ক্ষেত্র এবং জগতে এটা সর্বদা সত্য। অপরদিকে কন্টিনজেন্ট সত্য বিশেষ অবস্থাভেদে সত্য- অন্য কোন স্থান-কাল-পাত্রে তা সত্য না-ও হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপঃ এই কথাটি, 'অধিকাংশ বালক দুষ্ট', এটা কন্টিনজেন্ট- কারণ, কথাটি সত্য কিংবা মিথ্যা যে কোনটি হতে পারে। এটা নির্ভর করবে [কোন স্কুল, গ্রাম, শহর ইত্যাদিতে বসবাসকারী] অধিকাংশ বালক আসলে দুষ্ট কি না, তার ওপর। অরপরদিকে যদি বলি, 'এটা যদি সত্য হয়, সকল মেয়ে দুষ্ট এবং নাসিমা একটি মেয়ে, তাহলে এটি সত্য হওয়া অনিবার্য [নেসেসারী] যে, নাসিমা দুষ্ট মেয়ে'। [এখানে ব্যাপারটি আসলে লজিকের আওতাভুক্ত- এই যা]। নাসিমা আসলে দুষ্ট কি না তা নিশ্চিত হওয়ার একমাত্র উপায়, তার চরিত্রকে যাচাই করা।

যুদ্ধক্ষেত্রঃ সুতরাং, উপরে বর্ণিত বিপরীতমুখী তিন-জোড়া ব্যাখ্যার কোনটি অধিক সত্য? পশ্চিমা জ্ঞানবাদী দর্শনে এ প্রশ্নের সঠিক জবাব নিয়ে দু'টি দলে যুদ্ধ হচ্ছে। প্রথম দলের নাম '**রেশনালিস্ট**' আর দ্বিতীয়টির নাম '**এম্পিরিসিস্ট**'। রেশনালিস্টরা বলেন, আমরা দেখিয়ে দেবো, সিনথেটিক এ-প্রাইওরি উক্তি আছে যা জগৎ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য ও অর্থপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করে, তা সবই রেশনাল [যৌক্তিক] উপায়ে আবিষ্কার করা যায়। এর জন্য এম্পিরিটিক্যাল [যুক্তিহীন] উপায় অবলম্বন

জরুরী নয়। অপরদিকে এম্পিরিসিস্টরা বলেন, দৃশ্যত এ-প্রাইওরি তথ্যাদি, যেমন গাণিতিক সত্য, মূলত আনালিটিক।

রেশনালিস্ট ও এম্পিরিসিস্টদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব থাকলেও উভয় দল এক ক্ষেত্রে 'মতৈক্যে' আসতে বাধ্য। তারা মনে করেন, আমাদের জ্ঞানার্জন কিছু ক্ষেত্রে [কার্যকারণ কিংবা অভিজ্ঞতা] এর যে কোন এক বা উভয়টির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং, রেশনালিজম ও এম্পিরিসিজম উভয়টিই মূলত মৌলবাদী! পশ্চিমা জ্ঞানবাদে আর কি আছে?

হ্যাঁ, আরো একটি 'ইজমের' কথা শোনা যায়। এর নাম কোহেরেন্টিজম [coherentism]। এ ইজমের প্রবর্তকরা বলেন, জ্ঞান মূলত একাধিক 'বিশ্বাসের' জালের সমন্বয়। জালের প্রতিটি সূতা একটা আরেকটার সঙ্গে সংযুক্ত- সবগুলো একে অন্যের ভারসাম্য রক্ষা করে যাচ্ছে। পুরোটা মিলেই সৃষ্টি হয় একটি কোহেরেন্ট বডি বা কাঠামো। তবে, এ কাঠামো এমন যার না আছে কোন একক মূল বা ফাউন্ডেশন। কোহেরিন্টিস্টদের জনপ্রিয় শ্লোগান হলো, **'প্রত্যেক যুক্তিতর্কের জন্য প্রয়োজন এর প্রতিপাদ্য। কিন্তু এমন কিছু নেই যা প্রত্যেক যুক্তিতর্কের প্রতিপাদ্য'**।

চিন্তাখাদ্যঃ আপনি কিভাবে জানেন-চিনেন? জ্ঞানার্জন যুক্তিনির্ভর না অভিজ্ঞতালব্ধ? না অন্য কিছুনির্ভর?

১.চ. প্লেটো কর্তৃক জ্ঞানের সংজ্ঞা: ২৫০০ বছর পেরিয়ে গেছে। প্লেটোর 'তিন-আংশিক' [tripartite] জ্ঞান থিওরী এখনো 'পশ্চিমা' দুনিয়ায় প্রভাবশীল। এই গুরুত্বপূর্ণ থিওরীর সারসংক্ষেপ এই:

মনে করুন কোন এক ব্যক্তিকে আমরা 'ব' দ্বারা সম্ভোধন করলাম। আর যে কোন একটি ধারণাকে সম্ভোধন করলাম 'ধ' দ্বারা। এখন, ব শুধুমাত্র নিম্নের তিনটি ব্যাপার সত্য হলে ধ-কে জানতে পারে:

১. ধ সত্য।
২. ব ধ-কে বিশ্বাস করে।
৩. ব এর জন্য ধ-কে বিশ্বাস করা বিবেব-বুদ্ধি দ্বারা সমর্থনযোগ্য [জাস্টিফাইড]।

প্লেটোর মতে উপরোক্ত সংজ্ঞাত্রয় 'জ্ঞানার্জনের জন্য যথেষ্ট ও প্রয়োজনীয় প্রমাণ বহন করে'। ব্যাপারটা কঠিন মনে হয়। কিন্তু আসলে তা নয়। কন্ডিশন [condition] ১ ও ২ খুব সহজে অনুমেয়। আপনি মিথ্যা কিছু জানতে পারবেন না। আর আপনি যা জানেন তার উপর বিশ্বাস রাখাও জরুরী। কন্ডিশন ৩ এর ব্যাপারে কিছুটা মতানৈক্য আছে। তবে আধুনিক যুগ পর্যন্ত খুব অল্প জনই এ ব্যাপারে শক্তিশালী কোনো ভিন্নমত প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। অর্থাৎ জানার ব্যাপারে কোন ধরনের প্রমাণ বা সমর্থনযোগ্য গ্রাউন্ড থাকা দরকার। যেমন মনে করুন, আপনি বিশ্বাস রাখেন আবদুল্লাহ পরীক্ষায় পাশ করবেন। এরপর সত্যিই আবদুল্লাহ পাশ করলেন। এখানে প্রথম শর্ত তথা আবদুল্লাহকে আপনি সত্য বলে জানেন, দ্বিতীয় শর্ত তাকে আপনি বিশ্বাস করেন আর তৃতীয় শর্ত পূর্ণ হলো পাশের কারণে। যদিও তৃতীয় শর্ত পূরণ হয়েছে আপনার ধারণা 'সত্য' বলে প্রমাণিত হওয়ায়। আপনি ভাগ্যবান তা-ই এমনটি হলো। আবদুল্লাহ ফেল করতেও পারতেন। মোটকথা তৃতীয় শর্ত সম্পর্কে কিছুটা মতানৈক্য আছে- আমরা কিভাবে ব্যাপারটি জাস্টিফাই করতে পারি? সুতরাং শর্ত ৩ নিয়ে দার্শনিক তর্কযুদ্ধ চলছেই ... ।

চিন্তাখাদ্য: আমরা সত্যিকার অর্থে কখন জ্ঞানলাভ করি?

২. মন ও জড় [mind and matter] সমস্যাবলী

২.ক. মন-দেহ সমস্যাঃ আধুনিক বিজ্ঞান। ওয়াও! এটমের অভ্যন্তর থেকে অভ্যন্তস্থ রহস্য উদঘাটন করছে। অপরদিকে দূরতম গ্যালাক্সি সম্পর্কে তথ্য খুঁজে দেখছে বিজ্ঞান। জড় সম্পর্কে বিজ্ঞানের এই তথ্যানুসন্ধান সত্যিই আধুনিক যুগের সর্বাপেক্ষা বড় চমক। পশ্চিমা 'জড়বাদী' দর্শন এখন বিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত- এমনকি নিয়ন্ত্রিত। তারা মনে করেন জগত সম্পর্কে যাকিছু জানার তা বিজ্ঞান দ্বারা জানা হবে। কিন্তু কথাটি কতটুকু সত্য? বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা নিয়ে এখানে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। তবে একটা ব্যাপার সবাই মেনে নিয়েছেন, বা নিতে বাধ্য হয়েছেন: আমাদের নিজের মধ্যে লুকানো আছে সর্বাপেক্ষা রহস্যজনক, দর্শন-বিজ্ঞান দ্বারা আজো সুস্পষ্টভাবে অ-ব্যাখ্যাত, অথচ অস্বিত্বশীল হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত একটি জিনিস- এ জিনিসটির নাম 'মানব মন' [human mind]। এমন কেউ আছে কি যে দাবী করতে পারে, তার মন নেই? নেই চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি, আকর্ষণ, বিকর্ষণ, প্রেম-প্রীতি, আনন্দ-বেদনা কিংবা ঘৃণা-বিতৃষ্ণা? সর্বাপেক্ষা কট্টর নাস্তিকও এসব মানবিক বৈশিষ্ট্য নিজের মধ্যে বিদ্যমান থাকার ব্যাপারে অস্বীকার করতে পারবেন না। আর পশ্চিমা দার্শনিকরাও [এমনকি 'ধর্মবিশ্বাসহীন' দাবীদার দার্শনিকরাসহ সকলে] এ ব্যাপারে একমত, মানুষের চেতন ও অবচেতন মন অবশ্যই আছে। সুতরাং আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারিঃ 'মানুষের দেহ ও বাইরজগৎ মূলত জড়-সৃষ্ট কিন্তু মানুষ এক আলাদা বৈশিষ্ট্যের আধিকারী। যা না বিজ্ঞান, না দর্শন যথাক্রমে পরীক্ষা-নীরিক্ষা ও যুক্তি দ্বারা সঠিকভাবে ব্যাখ্যার ক্ষমতা রাখে।' উভয় জ্ঞনান্বেষার এই সীমাবদ্ধতা চিন্তাশীলদের নিকট দিবালোকের মতো স্বচ্ছ ও প্রকট।

মানব মন যারতার প্রাইভেট বস্তু। জগৎ ও অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রত্যেকের নিজস্ব আলাদা বুঝ আছে। সকলের মন আলাদা এককত্বের অধিকারী থাকা এর মূল কারণ। সুতরাং একে অন্যের মনের অভ্যন্তরে বিচরণের

ক্ষমতা আমরা রখি না। যার মনে যেটা, সেটা তার প্রাইভেট ব্যাপার। মন সম্পর্কে এ ধরনের ধারণা শুধু যে, 'ধার্মিক' চিন্তাশীলদের ক্ষেত্রে প্রজোয্য তা কিন্তু নয়- পশ্চিমা মনস্তাত্ত্বিক দার্শনিকরাও এটা বিশ্বাস করেন। সুতরাং কেউ যদি বলে মন বলতে কছিু নেই- তাহলে হয় সে পাগল না হয় রবট!

মনকে তাই দার্শনিকরা 'সাবজেক্টিভ' [subjective] বলেছেন। অজড় জগতে তার বিচরণ। অপরদিকে বিজ্ঞান কখনো তা-ই নয়: বিজ্ঞান-গবেষণা মূলত 'অবজেক্টিভ' [objective]। জড়জগত তার বিচরণ ক্ষেত্র। সুতরাং কেউ যদি বিজ্ঞানকে দর্শনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে চান- আর এটাই আজকের জড়বাদী দার্শনিকরা চেষ্টা করছেন, মূলত এ চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। জড়কে নিয়ে দার্শনিক চিন্তা করা জায়িয কিন্তু মনকে ছেড়ে দর্শন বা এভাবে বলা যায়, দর্শনে মনের স্থান নেই বলাটা না-জায়িয। কারণ, 'মন' না থাকলে কি ভাবে দর্শনচিন্তা সম্ভব বা দার্শনিক হওয়াই সম্ভব হবে কি ভাবে? অপরদিকে বিজ্ঞানীরা জড়জগতের সুপ্ত-ব্যাপ্ত, লুকানো-উন্মুক্ত 'যাবতীয়' বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে পারেন, আবিষ্কার করতে পারেন নতুন নতুন তথ্যাদি। কিন্তু মনকে নিয়ে সাবজেক্টিভ গবেষণা আদৌ কোন বিজ্ঞানীর দ্বারা সম্ভব নয়। কারণ বিজ্ঞান গবেষণা কখনো সাবজেক্টিভ নয়- বরং অবজেক্টিভ।

এখন, লক্ষ্য করুন এই চিত্তাকর্ষক প্রশ্নগুলো, 'চেনতার মতো রহস্যময় জিনিষ কিভাবে অস্তিত্বশীল হতে পারে বিজ্ঞানদ্বারা উন্মোচিত এই জড়সর্বস্ব ফিজিক্যাল বিশ্বে?'। আরো প্রশ্ন, 'আমাদের মন ও তার কার্যকলাপ কিভাবে জড়সৃষ্ট দেহের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে?'। এই জড়-অজড়ের সংমিশ্রণ অবশ্যই সত্য। কেউ এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করছেন না- কিন্তু এখনো সঠিক ব্যাখ্যাও পাচ্ছেন না। এখানে এসে একদিকে দর্শন ব্যর্থ আর অপরদিকে বিজ্ঞানও ব্যর্থ। আছে কি অন্য কোন কিছু এই হতাশার মধ্যে আশার আলো প্রদান করার? আছে- অবশ্যই আছে। এই

বস্তুটির নাম অহির্জ্ঞান! আমরা এ লেখায় এদিকে যেয়ে আলোচনা করবো না। শুধু বলে রাখলাম। কারণ, পুরো মনবেতিহাসে ধর্মবিশ্বাস স্বয়ং দর্শন ও বিজ্ঞানের উপর যে প্রভাব ফেলে এসেছে এবং এখনও আসছে তা অগ্রাহ্যের কোন উপায় নেই। যদি কেউ বলে, আমরা পুরোদমে ধর্মবিশ্বাসকে এক সাইডে রেখে জ্ঞানচর্চা করবো- তবে সে অবশ্যই ভ্রান্তির বেড়াজালে আটকা পড়বে। কারণ যে অহির্জ্ঞান দ্বারা পুরো মানবসমাজ নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবান্বিত হয়ে আসছে লিখিত ইতিহাসের পর থেকে, সে জ্ঞানকে একপাশে জব্দ রেখে জ্ঞানচর্চা! অচিন্তনীয় ব্যাপার। নয় কি?

যাক ফিরে আসছি [পশ্চিমা] দর্শন-জ্ঞান আলোচনার দিকে। দেখে নিই পশ্চিমা দর্শন মানব-মন ও জড়জগৎ সম্পর্কে কি বলে? এ প্রশ্নের উপর 'তাদের' চিন্তা নিয়ে আলোচনার পূর্বে বলতে পারি, 'মন-দেহ' এই সমস্যা নিয়ে তারা যে মাথা ঘামাচ্ছেন সেটা নিশ্চিত।

ঠিক জ্ঞানবাদের মতো ফ্রান্সের ঈসায়ী সপ্তদশ শতকের দার্শনিক রেনি ডেকার্ট মন-দেহের দর্শনের উপর যে প্রভাব ফেলেছিলেন তা থেকে আজো পশ্চিমা দর্শন মুক্ত হয় নি। বাইর জগতের সাথে তুলনা করে তিনি বলেছেন, অধিবিদ্যার দিক থেকে চিন্তা করলে আমরা বলতে পারি মন হলো, সম্পূর্ণরূপে আলাদা একটি বস্তু। একটি মানসিক পদার্থ হিসাবে তার মৌলিক স্বভাব হলো চিন্তা করা। মন ছাড়া বাকী সবই জড়। আর জড়ের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো ফিজিক্যাল স্থানকে দখল করা। তার মতে, জগতে দু'টি আলাদা উপজগৎ [realms] বিদ্যমান। এর একটির বাসিন্দা অজড় মনসমূহ। এদের আছে মেন্টাল বৈশিষ্ট্যাবলী যেমন চিন্তাক্ষমতা ও অনুভূতি। আর অপরটির বাসিন্দারা হলো বস্তুসর্বস্ব দেহসমূহ। তাদের আছে ফিজিক্যাল বৈশিষ্ট্যাবলী যেমন, ওজন, আকার ইত্যাদি। ডেকার্টের এই থিওরীর নাম 'substance dualism' [বস্তু দ্বিতত্ত্ববাদ]। পরবর্তীতে ইংরেজ দার্শনিক গিলবার্ট রাইল (১৯৪৯-এ তাঁর প্রণীত দ্যা কনসেপ্ট অব

মাইন্ড গ্রন্থে) এই থিওরীকে 'মেশিনে ভর্তি ভুত বিশ্বাস' বলে কটাক্ষ করেছিলেন। অর্থাৎ দেহ একটি মেশিন আর এর ভেতর অবস্থান করছে ভুত! এখানে অবশ্য ভুত বলতে মানবাত্মা বুঝাচ্ছে। অবশ্য রাইল কার্টেসিয়ান ডুয়েলিজম [Cartesian dualism]-কে এভাবে আক্রমণ করেই ছাড়েন নি। মাইন্ড-বডি সমস্যার একটি কথিত 'সমাধান' তিনি নিজেও উপস্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীতে আমরা এ ব্যাপারে আলোচনায় যাচ্ছি।

কার্টেসিয়ান ডুয়েলিজমের সমস্যাবলী ও সম্ভাব্য সমাধানঃ বৈজ্ঞানিক নীতিবিরুদ্ধতাঃ বিজ্ঞান বলে, যে কোন ফিজিক্যাল প্রতিক্রিয়া নির্ভরশীল ফিজিক্যাল অপর এক বা একাধিক ক্রিয়ার উপর। অন্যকথায়, একশন ছাড়া রিয়েকশন হয় না। এখন ভেবে দেখুন, আপনার মনে ইচ্ছা জাগলো পানি পান করবেন। ফলে আপনার হাত নাড়লেন ও পানিপূর্ণ গ্লাস ওঠায়ে পানি পান করলেন। বা আরেক দৃষ্টান্তঃ পথের কাটা পায়ে বিদ্ধ হওয়ায় বেদনা অনুভব করলেন। উভয় ক্ষেত্রে মন ও তনে ক্রিয়া করেছে। পানি পানের ইচ্ছা মনের ক্রিয়া এবং বেদনা অনুভবও মনের ক্রিয়া। অপরদিকে হাতের দ্বারা পানি পান ও পায়ে কাটা বিদ্ধ হওয়া তনের ক্রিয়া। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্রিয়া মন থেকে হলেও তার প্রতিক্রিয়া আত্মপ্রকাশ করছে তনে বা দেহে। আর ক্রিয়া তনে হলেও তার প্রতিক্রিয়া অনুভূত হচ্ছে মনে। মন ও তনে এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্ভব হবে না যদি এদেরকে সম্পূর্ণ স্বাধীন আলাদা বস্তু মনে করা হয়। আর এরূপ বিশ্বাসই হচ্ছে কার্টেসিয়ান ডুয়েলিজম।

কথিত আছে, রেনি ডেকার্ট নিজেও এ সমস্যা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। কিন্তু সমাধান খুঁজে দেখেন নি। তাঁর এক ছাত্র কিন্তু যুগের ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী খ্রিস্টান সমাজকে একটি 'সমাধান' দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। নিকোলাস মেইলব্রান্‌ক [১৬৩৮-১৭১৫] নামক এই দার্শনিক

লিখেছেন, উক্ত দৃষ্টান্তদ্বয়ে বর্ণিত কথিত 'মন ও দেহের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া' বাস্তবে ঘটে নি! আসলে, অনুরূপ সকল মন-দেহের মিথস্ক্রিয়ার সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন স্বয়ং প্রভু। তিনিই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টির কর্তা। তবে, জড়বাদ, সন্দেহবাদ ও চরম যুক্তিবাদের জালে আবদ্ধ পশ্চিমা আধুনিক দার্শনিকরা 'occasionalism' নামক এ থিওরীর উপর আজকাল মোটেই আস্থাশীল নন। কেন?

ওলন্দাজ দার্শনিক বারুন্চ স্পিনোজা [১৬৩২-১৬৭৭] ডেকার্টের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি কার্টেসিয়ান ডুয়েলিজমকে বদলে 'প্রপারটি ডুয়েলিজম' [property dualism] নামক আরেক দার্শনিক থিওরী উপস্থাপন করেন। এটাও মূলত রেনি ডেকার্টের থিওরী থেকে উদ্বুদ্ধ সমস্যাবলীর সমাধানকল্পে আবিষ্কৃত হয়। স্পিনোজা বলেছেন, ডুয়েলিজম থিওরী আসলে সাবজেক্টিভ নয় বরং প্রপার্টি বা বৈশিষ্ট্যভিত্তিক। দু' ধরনের আলাদা বৈশিষ্ট্য তথা মানসিক ও ফিজিক্যাল ব্যাপারকে একটি মাত্র বস্তু (ব্যক্তি) হিসাবে ধরে নেওয়া যায়। অর্থাৎ ব্যক্তির মধ্যে দু'টি বৈশিষ্ট্য থাকলেও উভয়ে মিলে মূলত এককে পরিণত হয়েছে। একই ব্যক্তি উভয়টির সমন্বয়ে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে। এই থিওরীকে বলে, 'double aspect theory'। কারণ, আমাদের যাবতীয় ফিজিক্যাল ক্রিয়ার সঙ্গে মানসিক সম্পর্ক বিদ্যমান। একটা ছেড়ে আরেকটা কাজ করে না। উভয়ের সমন্বিত ফলাফল হচ্ছে আমাদের ফিজিক্যাল অস্তিত্ব। সন্দেহবাদীরা অবশ্য স্পিনোজার এই সমাধানে সন্তুষ্ট নন। মন-দেহের ইন্টারেকশন কিভাবে হয় তা তারা এখনো সঠিকভাবে বুঝতে পারছেন না। একটি ফিজিক্যাল (বডি) আর অপরটি দেহহীন মেন্টেল (মন) বস্তু একত্রে কাজ করছে- ব্যাপারটি সন্দেহবাদীদেরকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিভ্রান্ত করেই যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতেও করতে থাকবে।

ও হ্যাঁ, দার্শনিকরা থেমে নেই কিন্তু! নতুন 'আইডিয়া' মাঝে-মধ্যে ভেসে ওঠে ঠিকই। এর একটি হলো দ্বিতত্ত্ববাদ মূলত ভুলের! জগতটা আসলে একটিমাত্র 'উপাদান' দ্বারা সৃষ্ট। হয় তা হতে হবে মেন্টাল (মনসর্বস্ব) না হয় তা হবে ফিজিক্যাল (বস্তুসর্বস্ব)। উভয়টি নয়। সে-ই ভাববাদ ও জড়বাদের দ্বন্দ্ব! পাঠক, পাল্লা কোন্ দিকে ভারী বলে আপনি মনে করেন?

আইরিশ দার্শনিক জর্জ বার্কেলী [১৬৮৫-১৭৫৩] প্রথমটি তথা ভাববাদের উপর বিশ্বাসী। তাঁর দাবী, বাস্তবতা মূলত মন ও ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। Reality consists of nothing but minds and their ideas। সুতরাং তাঁর দর্শন ডুয়ালিজমকে হত্যা করলো! তবে দু'য়ের একটিকে জিইয়ে রাখলো: সবকিছু মাইন্ড বা মন ও তার ক্রিয়া। বস্তুজগৎ মনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশের ক্ষেত্র মাত্র। এটা আলাদা কোন স্বয়ং অস্তিত্বশীল জিনিস নয়। বার্কেলী কর্তৃক আইডিয়েলিজমের এই পুনর্ব্যাখ্যা সে যুগে অনেকে গ্রহণ করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু চরম সন্দেহবাদ, চরম যুক্তিবাদ ইত্যাদি দার্শনিক থিওরীর সঙ্গে স্বভাবতই বার্কেলীর ভাববাদ সাংঘর্ষিক হয়ে ওঠলো। আর আধুনিক দার্শনিকদের অধিাংশই তাঁর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। তারা বলেন, এটা কেমন করে মানা যায় যে, দৃশ্যমান এই মহাবিশ্ব বাস্তবে অস্তিত্বশীল নয়? তারা মনে করেন, কোনো ধরনের 'ফিজিক্যালিস্ট' ব্যাখ্যাই হবে আসল সত্য।

বিজ্ঞানের প্রভুত উন্নতি দেখে এরা মানে ঐ ফিজিক্যালিস্ট দল বিশ্বাস করেন, মাইন্ড বা মনকেও বিজ্ঞান গবেষণার আওতাভুক্ত করে দেখতে হবে। আর বিজ্ঞানের আওয়াতুক্ত সবকিছুই যেহেতু 'অবজেক্টিভ' বা ফিজিক্যাল, তাই মনও ফিজিক্যাল হতে বাধ্য। এখন শুরু হলো এ চিন্তা: কিভাবে মন [একটি সাবজেক্টিভ ও ব্যক্তিগত বিষয়] সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ ফিজিক্যাল [অবজেক্টিভ এবং সর্বত্র প্রাপ্ত] বস্তুর সঙ্গে মিশতে পারে?

এই নতুন 'ফিজিক্যালিজম' [physicalism] দর্শন বেশ আঁকাবাঁকা পথে এগিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক নিউরোসাইন্স দ্বারা বুঝানোর চেষ্টা চলছে যে, আমাদের অনুভুতি, প্রেম-প্রীতি, চিন্তা-চেতনা, ইচ্ছাশক্তি, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, আকর্ষণ, আনন্দ-বেদনা ইত্যাদি নন-ফিজিক্যাল ব্যাপার মূলত মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে সৃষ্ট ফিজিক্যাল ক্রিয়া থেকে সৃষ্ট। আমরা নাকি ওসব ব্যাপার 'কল্পনা' করি মাত্র! ব্রেন আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করে! ভবিষ্যতে নিউরোবিজ্ঞানের চরম উন্নতি হবে। সেদিন আমরা নিজেদেরকে 'রবট' হিসাবেই দেখবো! আমাদের মন হারিয়ে যাবে! ইত্যাদি।

এক ঘষায় মাইন্ড-বডি সমস্যার অনেকটা মুছে দেওয়া হলো! চেতনাকে বৈজ্ঞানিক স্কোপে এনে বুঝানোর চেষ্টা? সত্যিকার 'চিন্তাশীল' মনীষীরা তা মানতে নারাজ। চিন্তা, চেতনা, উত্তেজনা, মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হেতু মগজে ফিজিক্যাল প্রতিক্রিয়া করতে পারে- এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে তা পর্যবেক্ষণও সম্ভব বটে। কিন্তু এসব সে-ই ব্রেনের প্রতারণা ভাবা মোটেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এ সমাধান অতিবেশী সহজ মনে নয়, মন একটি ফিজিক্যাল বস্তু? না, তা সম্ভব নয়। ফিজিক্যালিস্টদের বিরুদ্ধে অভিযোগের ঝড় উঠলো। অভিযোগকারীরা বললেন, তাদের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সমাধান মূলত আসল সত্য থেকে দূরে। কারণ, আমাদের চেতনশীল অভিজ্ঞতার মূল যে একমাত্র সাবজেক্টিভ হওয়া ছাড়া আর কিছু হতে পারে না, এ সত্যটি তারা বুঝতে পারেন নি।

মানুষ যদি কোনো ধরনের সুপার-রবট হয়ে থাকে তাহলে দূর ভবিষ্যতে হয়তো এই রবটই আরো বরট [কম্পিউটার] তৈরী করতে সক্ষম হবে যা তার নিজের কপি হবে! এরূপ কখনো সম্ভব হবে বলে কেউ এখনো সিরিয়াসলি ধারণা করেন নি। তবে চেষ্টা হচ্ছে ঠিকই। আমরা

অপেক্ষায় রইলাম। দেখি কেউ কোনদিন সত্যিকার 'চিন্তা-চেতনাশীল বুদ্ধিমান মেশিন' যা হবে ঠিক মানুষের মতো সবদিক থেকে 'ফটোকপি' বানাতে পারে কি না। মূলত, মানব মন ও তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী কী কখনো কম্পিউটার প্রোগ্রাম হতে পারে? এ প্রশ্নই আজকের মন ও জড় নিয়ে [পশ্চিমা] গবেষকদের 'মনকে' আড়ষ্ট করে রেখেছে।

চিন্তাখাদ্যঃ মন কেন এতো কথা বলে! মনের ভাব প্রকাশের নাম ভাষা- আর ভাব না থাকলে ভাষাও থাকতে পারে না। তাহলে মন-দেহের মিথস্ক্রিয়া কিভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায়? ভাবও কি মগজের ফিজিক্যাল ক্রিয়া থেকে সৃষ্ট? এটাও কি অবজেক্টিভ?

২খ. Identity crises: পরিচিতি সমস্যা: আপনি কে? আমি আবদুল্লাহ, মরহুম আবদুল মালিকের ছেলে, আমার ঠিকানা, অমুক জায়গায় ... ইত্যাদি হবে আপনার জবাব। কিন্তু দর্শনে এই 'পরিচিতি' যথেষ্ট নয়! আপনি জন্মের সময় দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে যেরূপ ছিলেন তা কি এই চল্লিশ বছর বয়সে এসে এখনও আছেন? অবশ্যই না। সময়ের ক্রিয়ায় আমার মধ্যে রদবদল ঘটেছে কিন্তু আমি তো সেই একই ব্যক্তি যে মায়ের উদর থেকে চল্লিশ বছর পূর্বে ধরার কোলে এসেছিলাম! মানলাম, এই একই 'ব্যক্তি' আপনি ঠিকই। কিন্তু আপনার ব্যক্তিত্ব [personality] নিশ্চয় সে-ই শিশুকাল ও এখন একই নয়। আপনি বিশ বছর পূর্বে সন্ত্রাসী ছিলেন- এজন্য আপনাকে আজ শাস্তিপ্রদান কী আদৌ সঠিক হবে? সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, আপনি যদি তখনকার ঐ অপরাধটি সম্পূর্ণরূপে ভুলে যান- তাহলে? আরো অনেক প্রশ্ন। পশ্চিমা দার্শনিকরা আইডেন্টিটি নামক অস্পষ্ট বিষয়টি বুঝার জন্য এভাবে প্রশ্ন করেন।

সুতরাং যে কোন ব্যক্তি ভিন্ন সময়ে বা বয়সে একই ব্যক্তি হওয়ার জন্য শর্তাবলী কী হতে পারে? মাথা ঘামতে শুরু হলো 'সবকিছু নিয়ে প্রশ্ন' করার মানসিকতাসম্পন্ন [পশ্চিমা] দার্শনিকদের। শত শত বছর পর বিজ্ঞানই শেষ পর্যন্ত কিছুটা আশার আলো যোগালো। মানব প্রাণীবিদ্যা [human biology] থেকে স্পষ্ট: আমি জন্মের সময় যে ব্যক্তি বা প্রাণী ছিলাম এখনও সেই প্রাণী। এখনও সে-ই মানব-জন্তু! [এটা পশ্চিমা দার্শনিকদের ভাষা, আমার নয়! তারা বলেন, I am the same human animal]।

ব্রেন ট্রান্সপ্লান্ট: যাক, উক্ত কথাটি সত্য। আপনি একই মানুষ। কিন্তু এটা তো আপনার দেহ সম্পর্কে বলছেন! আপনার ব্যক্তিত্ব কী এখনও একই? ভাববাদী দর্শনের সমস্যা এই ব্যক্তিত্ব নিয়ে। অপরদিকে

জড়বাদীরাও সমস্যা তৈরী করতে পটু! তারা আধুনিক মেডিকেল বিজ্ঞানের সম্ভাব্যতা দ্বারা যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। বলেন, মনে করুন আপনার মগজ বদলে দেওয়া হলো- যা হয়তো খুব শীঘ্র সম্ভব হবে। ইতোমধ্যে লিভার, কিডনি এবং হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট তো সফলভাবে হয়েই গেছে! আপনার ব্রেন আমার মাথার খুলিতে ঢুকানো হলো! আর আপনার খুলিতে আমারটি। আপনি অবশ্যই ভাববেন, আপনি এক নতুন দেহের মালিক হয়েছেন- অনুরূপ আমিও। সুতরাং এ থেকে এটাই অনুমিত হয়, বিশেষ কোন দেহের অধিকারী হওয়া ব্যক্তি পরিচিতির শর্ত নয়। কারণ তা যদি হয়, ব্রেন ট্রান্সপ্লান্টের পূর্বে আপনার যে পরিচিতি ছিলো [অন্তত দৈহিক দিক থেকে] এখন তা বদলে আমরাটিতে রূপান্তর হয়েছে, ঠিক অনুরূপ আমার ক্ষেত্রেও সত্য!

উক্ত যুক্তিতর্কের ফলস্বরূপ কিছু দার্শনিক একথা বলছেন, 'মানুষের পরিচিতি পূর্ণ দেহভিত্তিক নয় বরং শুধুমাত্র মগজভিত্তিক'। এই ধারণা উক্ত ব্রেন ট্রান্সপ্লাট সমস্যার সমাধান বলে অনুমিত হয় বটে- কিন্তু সমস্যা আরো আছে! ভাববাদীরা বলেন, আমাদের চিন্তার ক্ষেত্র হলো ব্রেন থেকে কিসব বেরিয়ে আসে তা-ই, স্বয়ং ফিজিক্যাল বস্তুনির্মিত ব্রেন নয়। এখন, আমাকে কি কি জিনিস 'আমি' বানায় তা একটু তলিয়ে দেখা যাক।

পশ্চিমা ভাববাদীরা বলেন, আমি 'আমি' হলাম অভিজ্ঞতা, স্মৃতি, বিশ্বাস ইত্যাদির যাকিছু আমার সঙ্গে সম্পৃক্ত 'তরল যন্ত্রাংশ' [software] মাত্র। আমি কখনো ব্রেন নামক একটি রসায়ন বস্তুর তৈরী দেহ-অরগ্যানের মতো 'কঠিন যন্ত্রাংশ' [hardware] নয়। লক্ষ্য করুণ, এখানেও আধুনিক বিজ্ঞানের আরেক চমক কম্পিউটারের সঙ্গে তুলনা। সফ্টওয়্যার যে কোন কম্পিউটারেই চলে সমানভাবে- সে কাজ করতে পারে আপনার পিসিতে কিংবা আমার ম্যাকিনটশে! সফ্টওয়্যারের আইডেন্টিটি সর্বদাই অপরিবর্তনশীল। এটা 'ফটোশপ', 'ইলোস্ট্রেটর' বা

যা-ই হোক, যে কম্পিউটারেই থাকুক, সেথায় কখনো নাম ও পরিচিতি বদলায় না। সুতরাং আমার আইডেন্টিটি কোন ফিজিক্যাল বস্তু- এমনটি মগজের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় মোটেই। আমি আমার মন, যেখানেই থাকি না কেন, আমি তো আমিই। আপনি আমার যাবতীয় মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার যদি কপি করতে পারেন অপরের ব্রেনে কিংবা কোনো কৃত্রিম মগজে তাতে কি আসে যায়? আমি সর্বদাই আমি। চিন্তা করুন পাঠক, 'আমিত্ববাদের' মূল কোথায়?

সাইকোলজিক্যাল সমাধান? হ্যাঁ, মন-জড় নিয়ে ডিগবাজীতে ঘুর্ণনরত [পশ্চিমা] দার্শনিকরা উপরোক্ত সমাধানে পুরোদমে সন্তুষ্ট নন। তারা আধুনিক যুগের 'মনস্তাত্ত্বিক' তথ্যাদি দ্বারা সমাধান খুঁজতে লাগলেন। তবে আগেই মনে রাখা উচিৎ এ প্রশ্নটি: তথাকথিত ফ্রোডিয়ান সাইকোলজি বা অন্য কোন সাইকোলজির উপর আমরা কতটুকু আস্থাবান হতে পারি? সাইকোলজির অনেকটাই সুস্পষ্ট প্রমাণহীন 'প্রতিপাদ্যে'র উপর নির্ভরশীল।

এবার দেখা যাক সাইকোলজি ব্যবহার করে তারা কি পেলেন? জন লকে [১৬৩২-১৭০৪] ছিলেন এই লাইনের গবেষক। তার থিওরী বুঝতে একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যায়। মনে করুন, আপনার সাইকোলজিক্যাল ইতিহাসের প্রতিটি অংশ পূর্বেকার অংশসমূহের সঙ্গে স্থায়ী স্মৃতি, বিশ্বাস ইত্যাদির সৃষ্ট 'দড়ি'র মাধ্যমে সংযুক্ত। সুতরাং আমার ইতিহাসে রদবদল হবে না- আমি আমি-ই রইলাম। জন লকে'র এরূপ গবেষণা দ্বারা যে থিওরীর আবির্ভাব ঘটে তার নাম 'phychological continuity' - আমরা বাংলায় বলতে পারি, 'মনস্তাত্ত্বিক ধারাবাহিকতা'। আধুনিক দার্শনিকদের অনেকেই এই থিওরীর উপর বিশ্বাসী। তবে তা সম্পূর্ণ নির্ভেজাল- তা কিন্তু নয়!

সন্দেহে পতিত দার্শনিকরা টিভি'র বৈজ্ঞানিক কাল্পনিক মহাকাশ-ভ্রমণ নাটক 'স্টার ট্রেক'র একটি জনপ্রিয় দৃশ্যকে গবেষণার হাতিয়ার বানিয়েছেন। নাটকে দেখা যায়, এন্টারপ্রাইজ তারাযানের ক্রু একটি কক্ষে দাঁড়িয়ে মুহূর্তের মধ্যে নিকটস্থ গ্রহের উপর চলে যাচ্ছেন। যাওয়ার পূর্বমুহূর্তে তাদের দেহ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়- এবং সাথে সাথে কো-অরডিনেট মুতাবিক গ্রহের নির্দিষ্ট স্থানে পুনরায় পুনঃসৃষ্টি হয়। এভাবে ভ্রমণকে বলে **'টেলিপোর্টেশন'** [teleportation] - বাংলায় **'টেলিপ্রতিস্থাপন'** বলা চলে। যাক, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে 'সাইকোলিজক্যাল কন্টিনুইটি' থিওরী মুতাবিক তারাযানের ক্রুরা সবদিক থেকেই মন-দেহসহ ট্রান্সপোর্ট হবেন- নিঃসন্দেহে, যেরূপ ক্যাপ্টেন কার্ক ও তাঁর ক্রুরা হয়ে থাকেন। কিন্তু টেলিপ্রতিস্থাপন মুহূর্তে যদি যান্ত্রিক কোন সমস্যা হেতু আপনার দেহ তারাযানে অক্ষত থেকে যায় এবং আপনার যাবতীয় দেহ-মনের তথ্যাদি গ্রহের উপর প্রেরিত হয়- তাহলে অবশ্যই আপনার একটি 'ডুপ্লিকেট কপি' সেখানে সৃষ্টি হবে! 'সাইকোলিজক্যাল কন্টিনুইটি' থিওরী মুতাবিক উভয় 'আপনা'র মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক সবকিছু সংরক্ষিত থাকতে বাধ্য। কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব? এটা তো এই থিওরীবিরোধী! সাংঘর্ষিক।

পাঠক! হয়তো কোনদিন ট্রেলিপ্রতিস্থাপন প্রযুক্তি দিনের আলো দেখবে না। তবে ... বলা যায় না। দার্শনিকরা অবশ্য নিজেদের 'থিওরী' গ্রহণযোগ্য করতে যেয়ে যে কোনো 'কাল্পনিক' দৃশ্য- তা যতোই উদ্ভট কিংবা অসম্ভব হোক না কেন, লজিক হিসাবে উপস্থাপন করতে মোটেই দ্বিধা করেন না। আমার [লেখকের] ধারণা, দর্শন শাস্ত্রে এতো বেশী থিওরী ও স্ববিরোধিতা, সন্দেহ ইত্যাদি স্থায়ীভাবে স্থান করে নেওয়ার একটি বড় কারণ এটাই। দর্শনে অতিবেশী 'মনগড়া অবস্থা' ও 'কাল্পনিক দৃশ্য' নিয়ে গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে।

এই উক্ত ‘কাল্পনিক’ দুর্ঘটনা হেতু আপনি দু‘জনে পরিণত হওয়ায় একটি থিওরীর উপর সমস্যার দুর্ভাগ্য জড়িয়ে পড়লো। এখন দরকার আরেক সমাধানের! অবশ্য, অনেকে সমাধান খুঁজতে সে-ই ইতোমধ্যে ব্যাখ্যাত ‘বাইয়োলজিক্যাল/এনিমেল’ থিওরীর দিকে ফিরে গিয়েছেন! অর্থাৎ আপনি হয়তো উক্ত দুর্ঘটনা শেষে ‘পুরাতন মাংস’ হিসাবে মহাকাশযান এন্টারপ্রাইজেই আছেন! গ্রহের উপর আপনি নন- সেখানে আপনার কপি মাত্র। কিন্তু নেই তাতে আপনার অভিজ্ঞতা, স্মৃতি, বিশ্বাস, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-প্রীতি- নেই আপনার মন। ভাবার ব্যাপার, এখন আমরা কোন্ থিওরীর উপর আস্থাশীল হবো? পাঠকরা চিন্তা করুন- তবে বেশী গভীরে যাবেন না!

চিন্তাখাদ্য: আপনাকে কোন্ জিনিস ‘আপনি’ বানিয়েছে? দর্শন শাস্ত্রের উক্ত গবেষণা দ্বারা আপনার পরিচিতি কতটুকু উদ্ঘাটন হয়েছে? না এর দ্বারা বিভ্রান্তির মাত্রা বাড়লো! আপনি সফ্টওয়্যার না হার্ডওয়্যার, না উভয়টি, না কোনোটিই নয়?

২গ. অপর মন সমস্যা [problem of other minds]ঃ আপনি নিজের মনকে সর্বাপেক্ষা বেশী বুঝেন। আমার বা অপর কারোর মনকে কতটুকু বুঝেন বা জানেন? এ প্রশ্ন করেছেন কি? দর্শনে এ প্রশ্ন নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ চলছে গরম গরম সংলাপ। আর সংলাপের টেবিলে সব সময় শুধুমাত্র 'মানব' ব্যক্তিত্ব উপস্থিত থাকেন- তা কিন্তু নয়। একদল 'হিউমেনোইড' [মানবসদৃশ যন্ত্র] যাদেরকে দার্শনিকরা 'জম্বি' বলে আখ্যায়িত করেছেন, প্রায়ই সংলাপ-কক্ষের মেহমান হয়ে থাকে। এরা দেখতে ঠিক আপনার আমার মতোই- তাদের হাঁটা, চলা, কথা বলা, পরা, খাওয়া, পান করা ইত্যাদি সবই আমাদেরই মতো। তারা যে জম্বি তা-ও অনেকসময় সনাক্তকরণ সম্ভব হয় না। এদেরকে আপনি লাতি, কিল-ঘুষি দিন- তারা ঠিকই চিৎকার করবে, উহ! আহ! বলবে। তবে আপনি ও আমার মতো কয়েকটি ক্ষেত্রে তারা ভিন্ন। জম্বিরা এক কাতরাও বেদনা অনুভব করে না। তাদের মধ্যে না আছে কোন অনুভূতি কিংবা চেতনা। সুতরাং ওহে! আমি আমার ক্ষেত্রে নিশ্চিত যে এ ব্যক্তিটি 'আমি'। কিন্তু আপনি? আমি কিভাবে বুঝবো জম্বি নন? জম্বি হলে তো আপনি কেউ ননঃ মেশিন, রবট, হিউমেনোইড, আই-রবট- কে জানে, এরূপ একটা কিছু হবেন। আমি আরো অগ্রসর হয়ে বলছি, "এ জগতে একমাত্র 'আমি' মহাসত্য! আর কেউ নন। বাকী সকল জম্বি বা অন্য কিছু!"

মোটকথা, নিজেকে যেরূপ আমরা বুঝি, অপরকে সেরূপ বুঝার কোন ক্ষমতা আমাদের নেই। আমার মন আছে, কিন্তু অপরের আছে কি না তা আদৌ নিশ্চিতভাবে জানার কোন উপায় আমার নেই। হ্যাঁ, আমার আপনজন, বন্ধু-বান্ধব এবং সাধারণ সকল মানুষ অন্তত দেহ ও চারিত্রিক দিক থেকেও কিছুটা 'আমার' মতো লাগে- তাই আমি মনে করি সকল মানুষেরই মন আছে। লজিকও একথা বলে, সকল মানুষের মন-দেহ উভয়টি আছে, তাই আবদুল্লাহ মানুষ এবং আমিও মানুষ- সুতরাং

আমাদের উভয়ের মন-দেহ আছে। তবে সমস্যা দাঁড়ায় তখন, যখন জম্বিরা এসে ঘিরে ফেলে আমাদের চিন্তা-চেতনাকে- যাদের সৃষ্টিকর্তা হলেন দার্শনিক নিজেরাই! এরা দার্শনিকদের গোল-টেবিল সংলাপ-কক্ষে ঢুকে মিশে যায় সকলের সাথে। এবার কিভাবে বুঝা যাবে, কে মন-দেহবিশিষ্ট আর কে শুধু দেহবিশিষ্ট?

আরো চিন্তা করে দার্শনিকরা বললেন, দেখুন- আমি জানি আমার একটি মন আছে। আছে এক অভ্যন্তরীণ চেতনাশীল অভিজ্ঞতাপূর্ণ জীবন আমার মাঝে। কিন্তু আপনার মনের সবকিছু তো আমার নাগালের বাইরে, দুর্ভেদ্য এক পর্দার আড়ালে। একমাত্র আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী ছাড়া আর কিছুই সরাসরি পর্যবেক্ষণের কোন ক্ষমতা আমার নেই। এটুকু তথ্য কি প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট যে, আমার মতো আপনারও একটি মন আছে? আরো রঙে রঞ্জিত করে বলি, "আমি কিভাবে জানবো ভাই, আপনিও একজন জম্বি বৈ নন?" বলবেন, ওরা তো কাল্পনিক বস্তু! আমি বলবো, ঠিক! কিন্তু ওরা তো শুধুমাত্র সংলাপের স্বার্থে কল্পনায় তৈরী করা হয়েছে- বাস্তবে আপনি ও আপনার মনতো আমার নিকট থেকে চিরকাল পর্দার আড়ালে থাকা রহস্য। আর এ ব্যাপারটি বুঝানোর জন্যই তো জম্বি নামক বস্তুর আবিষ্কার! আপনি তো ঠিক আমার মতোই, আপনার আছে চরিত্র, ঠিক যেরূপ আমারও আছে- কিন্তু আপনার মধ্যে চেতনা [conscious] নামক বস্তু আছে কি না তা তো আমি কখনো জানবো না- আর এ জন্যই আপনি আমার নিকট জম্বি। পাঠকরা আশারাখি বিভ্রান্ত হচ্ছেন না!

কেউ কেউ বলেন, আমাদের মানব ভাইবোনদের 'মন' আছে কি না প্রশ্ন করা মূলত সঠিক নয়। এরূপ প্রশ্ন অবান্তর। দার্শনিকরা জবাব দেন, এরূপ প্রশ্ন করা কি আদৌ 'যুক্তিহীন'? তাদের একজন বলেন, আজকের দর্শনে ফিজিক্যাল জগতে চেতনাশীলতার জায়গা সংকুলান এতো কঠিন

হয়েছে যে, হয়তো এভাবেই ব্যাপারটির একটি সমাধান দেওয়া যায়: একমাত্র মন আমি জানি- আমার নিজের - এটা এক বিরাট বিরল ব্যাপার বা এমনকি একক জিনিস। হয়তো আপনারা বাকী সকলে- মানে আপনারা জম্বিরা - আসলে সাধারণ, আর একমাত্র আমিই মন-হীন ভিন্ন!

সবশেষে: এ পর্যায়ে এক দু'টো ব্যাখ্যামূলক কথা ব্যক্ত করে প্রসঙ্গের ইতি টানছি। দর্শন ঠিক এরূপই: অনেক অদ্ভুত ব্যাপার ও সমস্যা সময় সময় চিন্তাবিদরা প্রকাশ করেন, যা কোনো সাধারণ ব্যক্তি কখনো কল্পনাও করতে পারেন না। কিন্তু সকলেই [এমনকি দার্শনিকরাও] জানেন, জম্বি সমস্যা বাস্তব কোনো সমস্যা নয়- আমাদের সবারই মন এবং দেহ উভয়টি আছে। কিন্তু তাই বলে দর্শনের গবেষণার স্বার্থে সৃষ্ট এই 'কাল্পনিক' জম্বি সমস্যা অগ্রহণযোগ্য ভাবা ঠিক নয়- এর দ্বারা মূল বিষয়টি অনুধাবনের ব্যর্থতাই প্রমাণিত হবে। বাস্তবে এ ধরনের সংলাপ থেকেই অনেক নতুন বিষয় আমাদের সম্মুখে উন্মোচন হয়ে থাকে। আর দার্শনিক ডেকার্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'কার্টেসিয়ান ডুয়ালিজম' বিরাট অধিবিদ্যা সম্পর্কিত তর্কের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল মানসিক ও ফিজিক্যাল ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা দিতে যেয়ে সেই সতোরে শতাব্দিতে। এ থেকেই 'অপর মন' সম্পর্কিত 'সন্দেহবাদের' শুরু। আর সন্দেহবাদ মৌলিকভাবেই 'সমস্যাবাদ' [problemism]। সন্দেহবাদ থেকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আরো সন্দেহের সূত্রপাত ঘটেছে। এর একটি কারণ হলো, প্রায়ই দেখা যায় উপরোক্ত জম্বি নিয়ে 'কাল্পনিক' একক একটি গবেষণা বা সংলাপ থেকে দার্শনিকরা দর্শনের নতুন আইন বা থিওরী প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু কিভাবে এরূপ একটি মাত্র গবেষণা দ্বারা ইউনিভার্সাল কোনো ফলাফল লাভ করা যেতে পারে? লুডউইগ উইটজেস্টাইনের [১৮৮৯-১৯৫১] ভাষায়, "একটি মাত্র কেইসকে আমি কিভাবে সাধরাণ আইনভুক্ত করতে পারি এতো দায়িত্বহীনভাবে?" [১৯৪৩ সালে প্রকাশিত তার এক লেখা থেকে]। কিন্তু দর্শনের ইতিহাস এটাই। পাঠকরা ভাবুন, কিভাবে আমরা 'সাধারণ' লোক দর্শনের উপর আস্থাশীল

হতে পারি? খাস করে দর্শনকে গ্রহণযোগ্য ভেবে আমাদের প্রাণের বিশ্বাসকে জলাঞ্জলি দেওয়া তো ঠিক হবে না- ঠিক কি না? যাক! আমার মতো নালায়েকের পক্ষে অতিরিক্ত বলা অনুচিৎ- দর্শনকে কতটুকু মানা যায় বা না, তা যদি আপনার জানার ইচ্ছে থাকে তাহলে ইমাম গাজ্জালীর [১০৫৮-১১১১] 'তাহাফুতুল ফালাসিফা' গ্রন্থখানা অধ্যয়ন করতে পারেন। গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ হয়েছে।

আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা দর্শনকে 'হামলা' করার উদ্দেশ্যে মোটেই নয়। এটা হবে ধৃষ্টতার সামিল! এটা অকাট্য সত্য, সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিস্টটল থেকে আধুনিক যুগের মার্কস, এঙ্গল, কান্ট, হিউম, রাসেল প্রমুখ মহাত্মন দার্শনিকরা মানবিক বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাজগতে অফুরন্ত খোরাক যুগিয়েছেন। দর্শন দ্বারা মানবসমাজ অনেকক্ষেত্রে [ভালো কিংবা মন্দের জন্যই হোক] নিয়ন্ত্রিত হয়েছে অতীতে এবং আজো হচ্ছে। সন্দেহ নেই ভবিষ্যতেও হবে। কিন্তু মনে রাখা উচিৎ দর্শনের রাস্তা আঁকাবাঁকা ও পিচ্ছিল। তার অভীষ্ঠ লক্ষ্য অস্পষ্ট। দার্শনিকরা ভালো চিন্তাশীল মানুষ। তাঁদের গন্তব্যস্থল 'সত্যোপলব্ধি', এটা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না। বিশেষকরে আজকের দর্শনের স্বরূপ আমাদেরকে এরূপ সন্দেহের বেড়াজালে দিন দিন বেশী বেশী করে আবদ্ধ করে দিচ্ছে। দর্শনের দু'টি মূল শাখা: জ্ঞানবাদ ও অধিবিদ্যার উপর অত্র গ্রন্থে অতি-সংক্ষিপ্তভাবে [পশ্চিমা] বিষয়-আশয়ের উপর আলোচনা থেকে এটাই আমাকে ভাবতে বাধ্য করেছে। জানি না, অপর দু'টি মূল বিষয়: চরিত্রদর্শন ও যুক্তিবিদ্যার উপর অনুরূপ তথ্যাসুন্ধান মনের মধ্যে কিরূপ ক্রিয়া করবে। আশা করছি, অচিরেই এ দু'টি বিষয়ের উপরও [পশ্চিমা] দর্শনের মূল কিছু ধারণা উপস্থাপন করার। তাওফিকদাতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

চিন্তাখাদ্য: জগতে 'আমি' আছি কি? থাকলে 'আমি' ছাড়া আর কেউ আছেন কি?

দর্শনের মূল কিছু আধুনিক [পশ্চিমা] ধারণা -২

৩. চরিত্র দর্শন [ethics]: ঘুর্ণিপাকের বেড়াজালে দার্শনিকরা

৩.ক. যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে: পশ্চিমা সকল আর প্রাচ্যবাসী অনেক চিন্তাবিদ দর্শনের মূল চারটি শাখার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও পৃথিবীর জনগোষ্ঠির প্রাত্যহিক জীবনচলার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয় 'চরিত্র দর্শন' [ethics] নিয়ে লিখিত ইতিহাস শুরুর সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত 'উষ্ণ সংলাপে' জড়িত আছেন। সঠিক চরিত্র দর্শন কোন্‌টি? এ প্রশ্নের জবাব সবাই খুঁজছেন- কিন্তু অধরার মতো সে জবাব আজো সবার নাগালের বাইরেই লুকিয়ে আছে। কেউ [মানে দার্শনিকদের- আর খাস করে পশ্চিমা দার্শনিকরা] সুস্পষ্ট কোন সর্বজন-গ্রহণযোগ্য থিওরী আবিষ্কার করতে পারেন নি। এ ব্যর্থতার কারণ কি? পশ্চিমা দর্শনের উপর এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে আশাকরছি তা-ই উন্মোচন হবে। ওয়ামা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ।

ডেভিড হিউমের 'গিলোটিন': স্কটিশ দার্শনিক ডেভিড হিউম [১৭১১-১৭৭৬] 'ট্রিটিজ অব হিউমেন নেচার' গ্রন্থে চরিত্র দর্শনের একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হাইলাইট করেছেন। যে কোন সূত্র থেকেই হোক: আমাদের কৃষ্টি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, ধর্ম বা অন্য কিছু- আমাদের মনে ক্রিয়া করে একঝাঁক পূর্ব-ধারণা বা বিশ্বাস। আমরা সর্বদাই কোন সিদ্ধান্তগ্রহণে বা কার্যসিদ্ধি ক্ষণে মনে করি, এভাবে হওয়া উচিৎ এবং ওভাবে হওয়া অনুচিৎ। হিউম প্রশ্ন করেন, 'আমরা কিভাবে 'হওয়া উচিৎ' কোনো 'স্বাভাবিক অবস্থা' থেকে আবিষ্কার করতে পারি?' তার মতে আমরা এরূপ করতে পারি না! কেউ কেউ তার সঙ্গে একমতও। তারা বিশ্বাস করেন, হিউমের 'গিলোটিন' [ফ্রান্সে আবিষ্কৃত মৃত্যুদণ্ড কার্যকরীর একটি গলা ছেদনযন্ত্র] বা

'হিউমের আইন' বস্তুতান্ত্রিক তথ্যজগৎ ও বিবেকভিত্তিক মূল্যবোধ জগতকে কেটে দু'টুকরো করে দিয়েছে। আমরাও তা-ই বলি। কারণ, হিউম এরূপ মনগড়া আইন তৈরী করে 'প্রকৃতিবাদের' জন্ম দিয়েছেন। পশ্চিমা জগতে এর বিরাট প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে, মানুষ নিজেকে এখন 'সৃষ্টির সেরা' না ভেবে সাধারণ জীব-জন্তু মনে করতে শুরু করেছেন! উল্লেখ্য ইয়াহুদী-খ্রিস্টবাদী ধর্মবিশ্বাসেও মানুষ সৃষ্টির সেরা হিসাবে স্বীকৃত। আমরা ধারণা করছি, হিউমের মতো এতো বড় দার্শনিক কয়েকটি কথায় মানুষকে তার প্রভুপ্রদত্ত উচ্চ মর্যাদা থেকে একেবারে জীব-জন্তুর কাতারে নামিয়ে এনেছেন কোনো অশুভ মুহূর্তে। মানুষের মধ্যে উচ্চমর্যাদাশীল 'মানবাত্মা' ছাড়াও 'জীবাত্মা' নামক আরেক নিম্নস্তরের বস্তু বাস করে। একে কেউ কেউ আরবীতে 'নফ্স' [নিজ] এবং ইংরেজিতে 'ego' বলেছেন। এটা যখন প্রভাবশীল হয়- বা মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে বসে, তখনই মানুষ নিজেকে হীন ও পশুসূলভ জন্তু ভাবে। এরূপ অবস্থার শিকার হয়ে হয়তো দার্শনিক হিউম উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন।

অবশ্য হিউমের উপরোক্ত আইন সবাই মেনে নিয়েছেন, তা কিন্তু নয়। নেচারেলিস্ট ডারউইন [১৮০৯-১৮৮২] গ্রহণ করেছেন ও জন্ম দিয়ে গেছেন আরেক তথাকথিত মনগড়া বিজ্ঞান, 'বিবর্তনবাদ' ঠিকই- এ ব্যাপারে এ লেখায় খুব বেশী বলতে চাই না। সমসাময়িক বা কিছুদিন পরের ইংরেজ দার্শনিক জি.ই. মোর [১৮৭৩-১৯৫৮] [১৯০৩ সালে তার প্রণীত প্রিন্সিপিয়া এথিকা গ্রন্থে] অভিযোগ এনেছেন, হিউমের আইন মূলত 'নেচারেলিস্ট ফালাসি...' বৈ নয়। তিনি আরো বলেছেন, অতীতের কিছু দার্শনিক চরিত্রকে 'প্রকৃতি'র সাথে তুলনা করেন- যা আদৌ ঠিক নয়। যেমন, 'ভালো'কে তারা 'আনন্দময়' অর্থে গ্রহণ করেন। কিন্তু যা আনন্দময় তা ভালো কি না তা নিশ্চিত করে কিভাবে বলা যায়? যেমন, কেউ চুরি করে আনন্দ পেলো [অল্প পরিশ্রমে অতিরিক্ত সম্পদের মালিক হলো]। এক্ষেত্রে চুরি করা ও আনন্দবোধ কি করে একই অর্থবোধক হতে

পারে? মোর তাই নেচারেলিজম মৌলিকভাবে চরিত্রদর্শনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলেছেন। তিনি মনে করেন, 'ভালো', 'মন্দ' ইত্যাদি শব্দ ও তাদের অর্থ মূলত 'নন-প্রাকৃতিক'- এগুলো চরিত্রদর্শনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এসব অতি-সহজ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর কী আছে? এসব কথার অর্থ সকলের বোধগম্য- এগুলো গবেষণাবহির্ভূত জিনিস। মানব 'চারিত্রিক বিবেক' হলো 'ইনটুইশন' [intuition] বা 'অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান'।

৩.খ. চরিত্র-ইজম্স [ethical isms]: চরিত্র দর্শন নিয়ে ভাবতে ভাবতে পশ্চিমা মনন কী পরিমাণ বিভ্রান্ত তার কিছু নমুনা এখন ব্যক্ত করছি। পাঠকদের আগেই বলে রাখি, মানুষ যে মূলত তার নিজের চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনে 'ঐশীজ্ঞানের মুখাপেক্ষী'- এ সত্যটি অনুধাবনে ব্যর্থতা বা এমনকি না-মানার কট্টরতা হেতু দার্শনিকরা এই বিষয়টিকে শুধু ঘোলাটে ও বিভ্রান্তিকর করে তুলছেন। এই বিভ্রান্তির মাত্রা আজকের দুনিয়ায় চক্রবৃদ্ধিহারে বেড়ে চলছে। মানবিক চরিত্র সঠিক ও সুন্দর হওয়ার জন্য প্রয়োজন নিজের মধ্যে লুকানো ইতোমধ্যে বর্ণিত 'নফসে আম্মারা' বা 'জীবাত্মা'র ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে ধাবিয়ে রাখা ও একে 'নফসে মুতমায়িন্নাহ' বা 'প্রশান্ত মানবাত্মা'র পর্যায়ে পৌঁছুনো- এটাই মানব-জীবনে উৎকর্ষ দান করতে পারে। আর এ লক্ষ্যর্জনের নামই 'তাসাওউফ সাধনা'। যাক সুফিতত্ত্বের উপর আলোচনা এ প্রসঙ্গের বিষয় নয়। দেখা যাক পশ্চিমা দর্শনে গঁজেওঠা বিভিন্ন জনপ্রিয় 'এথিকেল ইজম্স' কি বলে?

নাম ও ব্যাখ্যায় যাওয়ার পূর্বে আরো একটু ভূমিকার প্রয়োজন। পাশ্চাত্য দর্শনে এথিক্স বা মোরাল ফিলোসফি [ethics or moral philosophy] -কে সাধারণত তিনটি প্রশস্ত ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়ে থাকে। ১. মেটা-এথিক্স [meta-ethics]: এর দ্বারা চরিত্রদর্শনের মূল সূত্র নিয়ে গবেষণা হয়। অন্যান্য কাজের মধ্যে একটি হলো সূত্রটি মূলত সাবজেক্টিভ না অবজেক্টিভ তা তলিয়ে দেখা। ২. নরমেটিভ এথিক্স

[normative-ethics]ঃ এটার কাজ এথিকেল স্টেন্ডার্ড বা 'স্বভাব' যার উপর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ভরশীল সেদিকে গবেষণার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা। ৩. এপলাইড এথিকস [applied-ethics]ঃ এটাই সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের। অর্থাৎ চরিত্রদর্শনকে বাস্তব জগতের বিভিন্ন অবস্থায় ব্যবহার করা। এটাকে আমরা ব্যবহারিক চরিত্রদর্শনও বলতে পারি। যেমন, আজকের যুগে 'abortion' [গর্ভপাতন - জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা অন্য কোন ভয়ে পেটের সন্তান হত্যা], 'euthanasia' [রোগ-ব্যাধির চরম জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে ডাক্তারের সাহায্যে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ], আত্মঘাতী হামলা, যুক্তিপূর্ণ যুদ্ধ, জীবজন্তুর প্রতি ব্যবহার ইত্যাদি। এ তিনটি উপশাখার উপর দার্শনিকরা অসংখ্য ইজমের জন্ম দিয়েছেন। এ ক'টির উপর এখন আমরা আলোচনায় যেতে পারি। প্রত্যেকটি ইজমের বিশ্বাসীকে একেকজন -ইস্ট [-ist] বলে। অর্থাৎ থিওরীর নামের সাথে সংযুক্ত হয়েছে -ইস্ট। আমরাও থিওরীর নাম ও ইস্ট সংযুক্ত করে প্রতিটির ব্যাখ্যা তুলে ধরবো।

১. এবসুলুটিস্ট [absolutist]ঃ এদের বিশ্বাস যে কোন অবস্থা বা ক্ষেত্রে মানুষের কর্ম সঠিক [ভালো] কিংবা অঠিক [মন্দ]। তৃতীয় কোন ব্যাখ্যা নেই।

২. কনসেকুয়েন্টিয়ালিস্ট [consequentialist]ঃ এরা মনে করেন, কর্ম ভালো বা মন্দ হওয়া নির্ভর করে এ থেকে কোন্ ফলাফল আসছে, তার ওপর। সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ কনসেকুয়েন্টিয়ালিস্ট সিস্টেম হলো 'utilitarianism' [উপযোগিতাবাদ]। এই থিওরী বলে, যে কোন কর্ম ভালো না মন্দ তা যাচাই করতে হবে তার ফলাফল থেকে। বিশেষত, এ থেকে মানবিক সার্বিক ক্ষতিসাধক না উপরকার হচ্ছে তা দেখা জরুরী। ঈসায়ী অষ্টাদশ শতকে ইংরেজ দার্শনিক জেরেমি বেনথাম [১৭৪৮-১৮৩১] এই থিওরী প্রবর্তন করেন। তিনি কর্মের ফলকে 'ইউটিলিটি' [utility] বা 'উপযোগী' শব্দ দ্বারা বুঝিয়েছিলেন- তাই এই নাম।

৩. ডিওন্টোলজিস্ট [deontologist]: এদের কথা হলো, কিছু কর্ম আছে যা হয় ভালো [সঠিক] না হয় মন্দ [অঠিক] ফলাফল যেটাই হোক। কর্তার ইচ্ছা, কর্তব্য ও অধিকার কি তা-ও যাচাই-বাছাই করতে হবে। জার্মান ভাববাদী দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট [১৭২৪-১৮০৪] কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'কান্টিয়ান এথিক্স' সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ডিওন্টোলজিকেল সিস্টেম। এই তথাকথিত 'কর্তব্য-নির্ভর' চরিত্র-সিস্টেম পশ্চিমা বিশ্বে বিরাট প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল, এখনও করছে। কান্টের পরে দার্শনিকরা আরো যেসব চরিত্র-দর্শন থিওরীর প্রস্তাব দিয়েছেন, তার অধিকাংশই এই থিওরীর ব্যাখ্যা বা এ থেকে প্রভাবিত। এই এথিক্সের মূলে যা বলা হয়েছে তাহলো, যে কোন অবস্থায় নিজের কর্তব্য ও সত্যবাদিতাকে জলাঞ্জলি দেওয়া যাবে না। ফলাফল যেটাই হোক। আমরা পরে এ বিষয়ে আরো কিছু আলোচনা করবো।

৪. নেচারেলিস্ট [naturalist]: ইতোমধ্যে এ প্রকৃতিবাদীদের উপর কিছুটা তথ্য তুলে ধরেছি। এখানে আমাদের -ইস্ট লিস্টে এ নামটিও ব্যক্ত করে কিছুটা অতিরিক্ত ব্যাখ্যাসহ এর উপর আলোচনার প্রয়াস পাচ্ছি। কারণ, আজকের জড়বাদী বিশ্বে নেচারেলিস্ট তথা nudist বা 'উলঙ্গবাদী' মানবসন্তানের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। পশ্চিমা বিভিন্ন দেশে এখন একদল মানবগোষ্ঠির আবির্ভাব ঘটেছে যারা নিজেদেরকে খুব গর্বভরে 'নেচারেলিস্ট' বলে। তাদের উদ্দেশ্য সমুদ্র সৈকতের নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় যেয়ে নারী-পুরুষ-শিশু-কিশোর-কিশোরী সকলে শরীরের পরিধেয় খুলে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হওয়া! শুধু তাই নয়, নিজের সন্তানাদি, মা-বাবা প্রমুখ পরিবারের একান্ত আপনজনদের সামনে তারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে একত্রে ফুর্তি করেন!! পাঠক, মনে করবেন না এসব কথা অবাস্তব! গ্রেট ব্রিটেনের ব্রাইটন নামক সমুদ্র সৈকতে এরূপ একটি নেচারেলিস্ট বীচ [সমুদ্রকৈত] আমি নিজে দেখেছি। অবশ্য মুহূর্তও অপেক্ষা না করে এরূপ

'মানবিক চারিত্রিক অধঃপতনের চরম দৃশ্য' থেকে নিজেকে ভীষণ লজ্জা হেতু দ্রুত লুকিয়ে নিয়েছিলাম। চলে আসি দূরে- খুব আহত, ডিস্টার্বড্ মন নিয়ে। কে এই লোকগুলোর চরম বিপর্যয় ঘটিয়েছে? কারা এজন্য দায়ী? বলতে বাধ্য, পশ্চিমা তথাকথিত 'নেচারেলিস্ট দার্শনিকরা' দায়ী। অবশ্য নির্দিষ্ট বীচে এদের উলঙ্গপনাই মানব-চরিত্রকে পশুর মতো করে তুলে নি- 'আনন্দের জন্য যাচ্ছেতাই করবো'-মূলক এই দর্শনের প্রভাবে আজ সমগ্র বিশ্বব্যাপী উলঙ্গপনা খুব দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে। রাস্তা-ঘাটে এখন চোখ বন্ধ করে চলা ছাড়া উপায় নেই।

এই দর্শন বলে, চারিত্রিক বিষয়-আশয় একমাত্র নেচারেল সত্যতথ্য দ্বারা গবেষণা বা ব্যাখ্যা করা যাবে। ঠিক যেরূপ বিজ্ঞান জড়জগতের তথ্যাদি আবিষ্কার করে যাচ্ছে। ফ্রোডিয়ান সাইকোলজির মতো মানবিক সাইকোলজি বা মনস্তাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহ করে কোন্ জিনিসের মধ্যে সত্যিকার মানবিক আনন্দ [pleasure] নিহিত তা-ই নির্ধারণ করবে কর্তা কোন্ ক্রিয়া করবে। সুতরাং উলঙ্গপনা আর ফ্রি যৌন-সম্পর্ক যেহেতু মানুষকে সর্বাপেক্ষা বেশী আনন্দ দান করে তাই একে সঠিক চরিত্র বলে আখ্যা দিতে দোষ কিসের? আধুনিক যুগে এই দর্শন জেনে বা না জেনে টিভি ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে পুরো বিশ্বব্যাপী প্রচার করা হচ্ছে। মোটকথা এই দর্শন দ্বারা মানুষকে সাধারণ পশু প্রবৃত্তির সঙ্গে মিশ্রণ করার এক অভিনব পাঁয়তারা চলছে। তারা বলেন, নেচারের প্লেজারেবুল পুতুল মানুষ! সে অন্যান্য জীব-জন্তু থেকে তেমন আলাদা কিছু নয়। পশুরা যেভাবে রাস্তাঘাটে যৌনকর্মসহ সব ধরনের ইচ্ছার ক্রিয়া ঘটায়- মানুষকেও সেরূপ করতে দোষ কিসের? তারা চরিত্রদর্শন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অনেক মানবিক গুণকে কটাক্ষ করে বলে, এসবই ধার্মিক, সামাজিক বা কৃষ্টিগত 'ট্যাবু' [taboo]! যাক, আপাতত এদের সম্পর্কে আর কিছু বলবো না। অন্য কোন লেখায় হয়তো আলোচনা করবো।

৫. নন-কগনিটিভিস্ট [non-cognitivist]: এরা মনে করেন, চারিত্রিক ব্যাপার-স্যাপার জ্ঞানসম্পর্কিত কিছু নয়। কারণ 'চারিত্রিক' বানানোর ক্রিয়া কোন বিশেষ সত্য-তথ্যের উপর নির্ভরশীল নয়। আসলে- তারা বলেন, চারিত্রিক যাচাই-বাছাই কর্তার এচিটিউড, ইমোশন ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। এই দর্শনের উপশাখাদের মধ্যে আছেঃ ক. ইমোটোভিজ্‌ম [emotivism] ও খ. প্রেসক্রিপ্টিভিজ্‌ম [prescritivism]। প্রথমটির প্রবক্তারা বলেন, আমরা যখন কোন চারিত্রিক বিচার [moral judgement] নিয়ে ভাবি তখন নিজেদের ইমোশনাল [emotional] প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করি মাত্র। আমাদের নিকট কাজটি গ্রহণযোগ্য মনে হলে বলি, 'বাহবা'! আর অগ্রহণযোগ্য হলে ধিক্কার দিয়ে বলি, 'শেইম শেইম'! ইংরেজিতে একে 'hoorah!' 'boo!' থিওরী বলে। প্রথম শব্দটি ইতিবাচক ও দ্বিতীয় কথাটি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া। তবে উল্টো কথাও সত্য। থিওরীর প্রবর্তকরা কটাক্ষ প্রকাশে এরূপ বলেছেন। দু'টি বাক্যের কথা ভাবা যায়: 'হত্যা করা জঘন্য অপরাধ' এবং 'সত্য কথা বলা ভালো'। প্রথম বাক্যটি পছন্দনীয় নয়- তাই বলি 'boo to murder!' [এখানে হত্যাকে ঘৃণা উদ্দেশ্য]। দ্বিতীয় বাক্যটির প্রতিক্রিয়া যেহেতু সমর্থন করি তাই বলি 'hoorah for truth telling!' [এখানে সত্যবাদিতাকে পছন্দ উদ্দেশ্য]।

প্রেসক্রিপ্টিভিজ্‌ম [prescritivism] এর প্রবক্তারা বলেন, ডাক্তাররা রোগের প্রেসক্রিপশন দিয়ে থাকেন। অনুরূপ চারিত্রিক শব্দগুলো ভাবের দিক থেকে একই ধরনের অর্থ বহন করে। কারণ কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ ক্রিয়া সঠিক তা নির্ভর করে কিছু মৌলিক চরিত্রর্দশনের বিষয়ের উপর। যা মূলত নির্দেশমূলক। অর্থাৎ রোগ সনাক্ত করে ঔষধ সেবনের নির্দেশ। যেমন 'হত্যা একটি অপরাধ' এ কথাটি নির্দেশমূলক এই অর্থে যে, বক্তার উদ্দেশ্য এটাই নির্দেশদান- 'হত্যা করবে না!'। ইংরেজ দার্শনিক ই.এ. হেয়ার এই দর্শনের নেতা-প্রবর্তক। তিনি বলেন, এথিকেল বিচার-

বিবেচনামূলক নির্দেশসমূহের একটি বৈশিষ্ট্য হলো অন্য ধরনের নির্দেশের তুলনায় এগুলো সার্বজনীন। আমি যদি কোন মোরাল জাজমেন্ট ইস্যু করি, তাহলে আমাকে এটা গ্রহণ করতে হবে যে, এই জাজমেন্ট আমি নিজেসহ সকলে মেনে চলি এটার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়-আসয়ের ক্ষেত্রে। আর মোরাল মতানৈক্য তার মতে, স্ববিরোধী বা সাংঘর্ষিক নির্দেশ প্রদানের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। এসব ব্যাপার সুস্থ-মস্তিষ্কে সংলাপের মাধ্যমে সমাধান করা যায়। আধুনিক দার্শনিকরা বলেন, প্রেসক্রিপ্টিভিজমে মতানৈক্যের জায়গা বিদ্যমান। তবে উপরে উল্লেখিত হুরাহ! হুহ! থিওরীতে তা নেই।

৬. অবজেক্টিভিস্ট [objectivist]: এদের কথা হলো, মোরাল ভেলুজ [চারিত্রিক মূল্যবোধ] ও এর যাবতীয় বৈশিষ্ট্য [moral values and properties] মূলত মহাবিশ্বের ‘ফার্নিচার বা ফেব্রিক্স’। এগুলো কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির নিয়ন্ত্রণাধীন নয়- স্বাধীন। এথিকেল অধিকার সাবজেক্টিভ কিংবা কোন কিছুর সঙ্গে আপেক্ষিক নয়। এগুলো সত্য কিংবা মিথ্যা হতে পারে- যা নির্ভর করে যেভাবে বিষয়বস্তু জগতে আছে তার সঙ্গে কতটুকু সামঞ্জস্যশীল, তার দ্বারা। এথিকেল কনসেপ্টগুলো অধিবিদ্যার দিক থেকে বাস্তব বলে অভজেক্টিভিজম দর্শনের বিশ্বাস।

৭. সাবজেক্টিভিস্ট [subjectivist]: এরা মনে করেন, মূল্যবোধ বাইরজগতের বাস্তবতায় স্থিত নয়। এটা হয় আমাদের দেহের অভ্যন্তরে না হয় এর [মূল্যবোধের] প্রতি আমাদের ইমোশনাল প্রতিক্রিয়ায় স্থিত। শেষোক্ত বিশ্বাস অনেকটা ইতোমধ্যে বর্ণিত [উপরে দেখুন] নন-কগনিটিভিস্টদের মতো। অপরদিকে আগেরটি মূলত কগনিটিভিস্টদের বিশ্বাস বৈ নয়। সাবজেক্টিভিস্টরা এটাও মনে করেন, এথিকেল সত্য বিদ্যমান। কিন্তু এগুলো অবজেক্টিভভাবে সত্য কিংবা মিথ্যা তা তারা মানতে নারাজ। এ ধরনের অবজেক্টিভিজম দর্শনের একটি শাখার নাম রিলেটিভিজম। নিম্নে এর উপর কিছু আলোচনার প্রয়াস পাচ্ছি।

৮. **রিলেটিভিস্ট [relativist]:** বিখ্যাত গ্রীক ইতিহাসবিদ হিরোডটাস [খ্রি.পূ. ৪৮৫-৪২৫] একটি ছোট্ট গল্প লিখেছিলেন। সমসাময়িক কবি পিন্ডার [খ্রী.পূ. ৫১৮?-৪৩৮?] 'Custom is king of all' [কৃষ্টি সকিছুর বাদশাহ] নামক একটি কবিতা লিখেন। হিরোডটাস এটির সমর্থনে গল্পটির বর্ণনা দেন। তখন পারস্য সম্রাট দারিয়াসের সময় [খ্রি.পূ. ৫৫০-৪৮৬]। একদিন সম্রাট তার রাজদরবারে উপস্থিত কিছু গ্রীকদের প্রশ্ন করলেন, 'হে গ্রীকরা! বলতো, আমি যদি বলি নিজেদের পিতার মরদেহ ভক্ষণ করো! এর বিনিময়ে তোমারা কি চাইবে?' গ্রীকরা একবাক্যে জবাব দিল, 'মহাত্মন! টাকার বিনিময়ে আমরা এ অকল্পনীয় কাজটি কখনো করবো না!'। পরে এই গ্রীকদের উপস্থিতিতে দারিয়াস একদল ভারতীয় 'কালাটিয়ান' সম্প্রদায়ের লোকদেরকে প্রশ্ন করলেন, 'হে কালাটিয়ানরা! তোমাদের পিতার মরদেহ অগ্নিদগ্ধ করতে তোমরা কী বিনিময় চাইবে?' তারা একবাক্যে জবাব দিল, 'হে মহান রাজাধিরাজ! আমরা অর্থ কিংবা যে কোন কিছুর বিনিময়ে এ জঘন্য কাজটি করতে অপারগ!'। গল্পের এখানেই শেষ। তবে জানা থাকা দরকার, সে সময় গ্রীকদের কৃষ্টি ছিলো মরদেহ অগ্নিদগ্ধ করা আর কাটালিয়ানদের কৃষ্টি ছিলো মরদেহ ভক্ষণ করা।

হিরোডটাসের এই গল্পের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে একদল দার্শনিক 'রিলেটিভিজম' [আপেক্ষিকতা] নামক চরিত্রদর্শনের জন্ম দেন। তারা অবশ্য আধুনিক যুগে আলবার্ট আইনস্টাইন [১৮৭৯-১৯৫৫] কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের থিওরী 'আপেক্ষিকতাবাদের' সঙ্গে এই দার্শনিক থিওরীর সামঞ্জস্য খুঁজেন! কিন্তু বাস্তবে এ দুয়ের মধ্যে রাতদিন তফাৎ। কোথায় জড়জগতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা [আপেক্ষিকতাবাদ] আর কোথায় চরিত্রদর্শনের শত ব্যাখ্যার একটি [আপেক্ষিকতা]! বিজ্ঞান আদৌ কোন দর্শনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয় নয়। হ্যাঁ দর্শন যদি বিজ্ঞানের কোন থিওরী বা

সত্যকে ব্যবহার করে তাহলে সেটা দর্শনের স্বাধীন ব্যাপার- বিজ্ঞানের কিছু যায় আসে না। দর্শন না থাকলেও বিজ্ঞানের কোন ক্ষতি নেই। বিজ্ঞান সম্পূর্ণটাই জড়জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও এর উপর গবেষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তার বিচরণ কখনো অজড়ে নেই- হবারও নয়। সুতরাং কোন কথিত বিজ্ঞানীও যদি বলেন, 'বিজ্ঞান বলে মানুষের আত্মা নাই' তাহলে সেটা হবে তার নিজস্ব উক্তি মাত্র- হ্যাঁ বিজ্ঞানকে সম্পৃক্তকরণ শুধুমাত্র নিজের এই 'বিশ্বাস' বা 'অবিশ্বাসকে' গ্রহণযোগ্য করার পাঁয়তারা মাত্র!

বিজ্ঞানের উপর প্রয়োজনমাফিক গবেষণা করে এটা স্পষ্টভাষায় ঘোষণা দিতে পারি যে, 'বিজ্ঞান ও দর্শন সম্পূর্ণ আলাদা দু'টি বিষয়। বিজ্ঞান হলো বস্তুজগতের দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সকল স্তর, মাত্রা, স্থান-কালে ব্যপ্ত জড় ও এনার্জির ক্রিয়াকলাপ আবিষ্কার ও মানবকল্যাণে ব্যবহারের একটি প্রণালীবদ্ধ জ্ঞানান্বেষা। অপরদিকে দর্শন মূলত যুক্তিতর্কভিত্তিক সৃষ্ট জগতে মানুষের স্থান, অস্তিত্ব, জীবন-মৃত্যু ইত্যাদি জগৎ ও মানুষ ও এতদুভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করে। দর্শনের উদ্দেশ্য নয় অণুর অভ্যন্তরে কী আছে বা কোন্ কোন্ ফোর্স কিভাবে ক্রিয়া করছে তা আবিষ্কার করা। কিংবা এটাও নয়- মহাবিশ্বে সৌরজগতের সৃষ্টি, অবস্থান, কাঠামো, গতিবিধি ইত্যাদি উন্মোচনে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নীরিক্ষা এবং থিওরী উপস্থাপন করা। না, এসবই বিজ্ঞানের কাজ। আসলে, কথাটা আমি ব্যক্ত করবো কি না ভাবছিলাম, এ মুহূর্তে ব্যক্ত করেই দিচ্ছি- আধুনিক দার্শনিকরা ঠিক জানেন কি না সন্দেহ যে, মূলত তারা কি নিয়ে ভাবছেন? তাদের শেষ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কি তারা সঠিকভাবে ব্যক্ত করতে পারছেন না! বিজ্ঞান এখন দর্শনকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এই প্রতিযোগিতা বা দৌড়ে বিজ্ঞানের সাথে তাল মিলাতে না পেরে এখন দার্শনিকরা হাত মিলাতে অগ্রসর হয়েছেন। সুতরাং সেদিন বেশ দূরে নয়, দর্শনের চিন্তা-চেতনার খোরাক আর অবশিষ্ট থাকবে না। বিজ্ঞানের নিকট সম্পূর্ণরূপে

আত্মসমর্পন ছাড়া উপায় থাকবে না। দর্শন, তথা পশ্চিমা এলোমেলো, উদ্দেশ্যহীন, জড়বাদী চিন্তা-চেতনার অবসান ঘটবে। আর যা থাকবে, হয়তো একাডেমিক সার্কেলের বাইরে যেতে অপারগ হবে। এক পশ্চিমা দার্শনিক তো তাই মনে করেন, ‘Philosophy is now seen as the archetypal academic discipline, its practitioners firmly closeted in their ivory towers, detached from the problems of real life.’ [৫০ philosophy ideas you really need to know, Quercus Philosophy, London, pp. 3]

যাক, বাস্তবে রিলেটিভিজম বিভিন্ন কালচার, ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদির প্রতি অপেক্ষাকৃত কম সাংঘর্ষিক। চরিত্রদর্শনের অনেক ব্যাপার আছে যা স্ব-স্ব দেশ, গোত্র ও ধর্মের কৃষ্টি-বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এগুলোকে অন্য যারা পছন্দ করেন না, তাদের কী অধিকার আছে পরিবর্তন কিংবা বর্জন করতে নির্দেশ দেওয়ার? গ্রীকরা শবদেহ পুড়িয়ে দেওয়া আর কালাটিয়ানরা খেয়ে ফেলা মূলত উভয় গোষ্ঠির নিজস্ব কৃষ্টি বা ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। তাই বলে একে অন্যকে ঘৃণা করা কি আদৌ ঠিক হবে? সুতরাং গ্রীকদের পক্ষে কাটালিয়ানদের কাষ্টম বন্ধের নির্দেশ যেরূপ উচিৎ হবে না, ঠিক অনুরূপ গ্রীকদেরকে কালানিয়ানদের কর্তৃক কাস্টম পরিবর্তন বা বন্ধের নির্দেশ প্রধান ঠিক হবে না।

তবে রিলেটিভিস্টিকদের থিওরীর আওতাভুক্ত যেটুকু পর্যন্ত হওয়ার কথা তার থেকেও বেশীদূর এগিয়ে গেছে। হিরোডটাসের উক্ত গল্পের উপর ভিত্তি করে এটুকু বলা হয়তো সর্বজনগ্রহণযোগ্য হতে পারে: “ধর্ম ও কৃষ্টিভিত্তিক মৌলিক কিছু কাস্টম যারতার ব্যাপার। এতে অন্যদের নাক গলানো অনুচিৎ ও সময় সময় এ থেকে অহেতুক তথাকথিত কালাচারেল ক্লাশ বা কৃষ্টিগত সংঘর্ষ বাধতে পারে। সুতরাং আমাদেরকে এসব ব্যাপারে

সহনশীল হওয়া চাই।" কিন্তু থিওরীর প্রবর্তকরা এটুকু বলার পর আরোও বাড়িয়ে ব্যাপারটিকে পুরোদমে 'সার্বজনীন' পর্যায়ে নিয়ে বলেন, "সাধারণত কোন নিষ্কলুষ কিংবা সার্বজনীন সত্য নেইঃ সকল চারিত্রিক কর্ম ও তার উপর বিবেচনা একমাত্র আপেক্ষিক দৃষ্টিকোণ থেকে করতে হবে- কারণ সবই নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠি বা দলের সামাজিক স্বাভাবিকতার উপর।"

বিষয়টি বুঝাতে তারা সচরাচর ব্যবহৃত বাক্যের উপমা তুলে ধরেন। যেমন, 'আপনি টমেটো পছন্দ করেন, কিন্তু আমি করি না।' এখানে এটাই বুঝাচ্ছে, আপনার জন্য কোন ব্যাপার সঠিক কিংবা সত্য- কিন্তু আমার কাছে তা অঠিক বা অসত্য। এ ধরনের উপমা থেকে এটাই অনুমেয় যে, সত্য মূলত পছন্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত! আমি যদি হৃদয় থেকে কোন কিছু পছন্দ করি, তাহলে তা ভুলের হতে পারে না! পাঠক, কথাটির শেষে সাধারণ দাড়ি না লিখে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন কেন দিলাম? হৃদয়ে যদি অন্যায়, অসামাজিক, নিজ কিংবা অপরের জন্য ক্ষতিকর কোন কিছু 'পছন্দনীয়' মনে হয় তাহলেই কী ঐ বস্তু, ক্রিয়া বা কাজটি গ্রহণযোগ্যতা পাবে? দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়ঃ অপরের সম্পদকে আমি বেশ পছন্দ করি! এই পছন্দ করা ও তা কৌশলে গ্রাস করা কি বৈধতা পেলো না? এই দর্শন মুতাবিক অবশ্যই পোলো। কারণ এই দর্শন বলছে কোন কিছু আন্তরিকভাবে পছন্দ করলে তা হবে চারিত্রিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য। আমাদের জীবনচলার পথে অনেক কিছু আছে যা আমরা পছন্দ করি- কিন্তু মূলত এগুলোর প্রতি আকর্ষণ চারিত্রিক গুণাবলীর আওতাভুক্ত নয়। মানুষের মনকে দর্শন দ্বারা 'মুক্ত করা' এক কথা, আর লাগামহীনভাবে ছেড়ে দেওয়া ভিন্ন কথা। ঠিক এ জিনিসটিই হচ্ছে পশ্চিমা দর্শনে। আর দুর্ভাগ্যবশত প্রাচ্যের কিছু পশ্চিমাবাদী দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা তা আমদানী করে হাজার হাজার বছরের ললিত প্রাচ্যের উত্তম চরিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলীকে গিলোটিনের শানদার ব্লেডে হত্যা করছেন! পশ্চিমা জড়বাদী, ধর্মহীন, ঐশীজ্ঞানবিরুদ্ধ মনগড়া দর্শনকে যে কোন মূল্যে

প্রত্যাখ্যান করতেই হবে। অন্যথায় কেউ আর রাস্তায় চোখ খোলে বের হতে পারবেন না! নিরাপদও থাকবেন না!

পাঠক! জড়বাদী পশ্চিমা তথাকথিত বিজ্ঞানসম্পন্ন দর্শন মূলত আমাদের মতো আস্তিকদের জন্য ক্যান্সার রোগের মতো। আমাদের মধ্যেই লুকানো আছে সদ্‌চরিত্র বিরোধী অনেক উপাদান। যাদেরকে রিপু, নফসে আম্মারার কুমন্ত্রণা বা শয়তানের কুমন্ত্রণাও বলে। জড়বাদী দর্শন-আর বিশেষকরে জড়বাদী চরিত্রদর্শন যখন আমাদের চিন্তা-চেতনায় জায়গা করে নেয় তখন ওসব কুমন্ত্রণাদাতারা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অচিরেই ব্যক্তির উত্তম চরিত্রিক গুণাবলীগুলো পর্দাবৃত হয়ে পড়ে। আর অপরদিকে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে নীতি-নৈতকতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রতি আকর্ষণ। এভাবে দর্শনরোগের কবলে পড়ে মানুষ শেষ পর্যন্ত দুনিয়াদার প্রকৃতিবাদীতে রূপান্তর হয়। এখন সে, রাস্তায় উলঙ্গ থাকুক কিংবা অপরের ধন-সম্পদ লুট করুক তাতে তার বিবেক-বুদ্ধি বাধাদান করে না। আর যদি করেও দর্শনের ঐসব কথা, বিভ্রান্তি, ভুলবুঝাবুঝি বিবেককে হারিয়ে ফেলে অনেক ক্ষেত্রে মনের কাঠগড়ায়। এভাবেই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তির চারিত্রিক সৎ গুণাবলী দুর্বল হয়ে পড়ে। সে এখন সমাজ ও ধর্মের জন্য বিরাট বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। দর্শনের ভুল ব্যাখ্যা ও একে সঠিকভাবে না জানার চরম পরিণতি এরূপই।

এসব কথা আমার ব্যক্তিগত গবেষণার ফসল। সর্বক্ষেত্রে সকল পাঠক একমত হবেন তা আমি বলছি না। তবে ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা করা উচিৎ। যে কোন দার্শনিক থিওরী তার সূত্র প্রাচ্য বা প্রতিচী হোক, বিনাপ্রশ্নে গ্রহণ করা কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে তো নয়-ই বরং উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞানবান ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও সমুচিত হবে না বলে আমি মনে করি। ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে, অপরিপক্ক মগজে যে কোন ধরনের দার্শনিক থিওরী বা যুক্তিতর্ক ঢুকিয়ে দিলে ভীষণ ক্ষতির আশঙ্কা আছে। অবুঝ শিশুদেরকে সাপ নিয়ে খেলতে দেওয়া কি ঠিক হবে?

যাচ্ছেতাই করো! চরম রিলেটিভিজম এর চরম পরিণতি- এটাই স্বাভাবিক। দেখুন, ক্যাথলিক খ্রিস্টান-বিশ্বের চীফ ধর্মজাজক পোপ বেনেডিক্ট জুন ২০০৫ সালে দেওয়া এক বক্তব্যে কি বলেছেন?

"আজ, শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ক্ষতিকর বাধা বিরাট শক্তিসহ আমাদের সমাজ ও কৃষ্টিতে শেকড় গেড়ে বসেছে। এটার নাম রিলেটিভিজম। এ দর্শন কোন কিছুকেই চুড়ান্ত বলে মনে করে না, ফলে নিজ ও এর আকাঙ্ক্ষাসমূহ ছাড়া মানবিক আর কোন কিছুর প্রতি তাদের আস্থা নেই। আর ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে এই নিজ [সেল্‌ফ] এখন সবার জন্য বন্দীশালায় পরিণত হয়েছে। কারণ এটাই মানুষকে একে অন্য থেকে আলাদা করে রাখছে, প্রত্যেক নারী কিংবা পুরুষ নিজের এই 'নফস' [ego] এর মধ্যে এখন তালাবদ্ধ।"

অধুনা রিলেটিভিজম দর্শনের প্রভাব চরমভাবে রাজনীতি ও সমাজজীবনে পরিলক্ষিত হচ্ছে। 'কোন কিছুই চরম সত্য নয়, সবকিছু রিলেটিভ বা আপেক্ষিক' এই ধারণাই প্রভাবের কারণ। এ কথা দু'টোকে মানুষ এই অর্থে নিচ্ছেন: সবকিছুই সমভাবে গ্রহণযোগ্য। সুতরাং যাচ্ছেতাই করো! [anything goes]। রোমান ক্যাথোলিক চার্চের একাংশসহ সাধারণ জনসমাজে এ ধরণের বিশ্বাস মাথাচাড়া দিয়েছে। চার্চের বুদ্ধারা পশ্চিমা জগৎ তথা পুরো বিশ্বসমাজে নৈতিক অবক্ষয় ও খাস করে 'ফ্রি যৌনাচারের' জন্য এই রিলেটিভিস্টিক থিওরীকে দায়ী করেছেন। পোপ বেনেডিক্ট কর্তৃক উপরে উদ্ধৃত মন্তব্য থেকে তা স্পষ্ট।

মানব ইগো বা নফসকে এই থিওরী সম্পূর্ণ মুক্ত করে দিয়েছে। একদল তথাকথিত চরম লিবারেল বা চরম মুক্তমনাদের আবির্ভাব ঘটেছে। এরা আনন্দ-ফুর্তিকে জীবনের মূল লক্ষ্য মনে করে। তারা সামাজিক ও রাজনীতিক অঙ্গনে এই শ্লোগান বার বার উচ্চারণ করছে, "খাও-দাও ফুর্তি করো, এনিথিং গোজ!"। অবশ্য ধর্মবিশ্বাস তাদের জন্য বিরাট বাধা! বিশেষ করে পৃথিবীর একটি বৃহত্তম ধর্ম ইসলামে চরিত্রদর্শন একটি

গুরুত্বপূর্ণ দিক। সঠিক নৈতিক চরিত্রগঠনে প্রয়োজন নফসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এই যুদ্ধ ছেড়ে দিলে ঈমান-আমলে ভাটা পড়ে। এমনকি শেষ পরিণতিতে ‘ঈমানহীনতা’ও ব্যক্তিকে গ্রাস করে নিতে পারে। সুতরাং পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত ও খাস করে প্রাচ্যের অনেক মুসলিম অধ্যুষিত দেশে ‘এনিথিং গোজ’ শ্লোগান উচ্চারণ ও বাস্তবায়ন কঠিন কাজ। দেশীয় ‘মুনাফিক’ চরিত্রের লোকদের কিন্তু অভাব নেই। এরা সমাজের অভ্যন্তরে নামধারী ‘মুসলমান’ সেজে জেনেশোনে পশ্চিমা এ ধরনের নৈতিক চরিত্রবিরোধী ফ্রি যৌনাচারসর্বস্ব ‘pleasure-based’ কৃষ্টি-কালচার আমদানী করতে মরিয়া-হয়ে ওঠেছে। দুর্ভাগ্যবশত তারা অনেকটা সফলও হয়েছে। বলতেই হবে, তথাকথিত ‘সাধারণ শিক্ষিত’ মানুষের মধ্যে আজকাল ঈমানের নূর কমে ক্ষীণমাত্রায় পৌঁছে গেছে। অতি সহজেই এরা প্লেজার-বেইজ্ড নফসে আম্মারাকে উজ্জীবিত ও শক্তিশালী করার ফর্মুলাসর্বস্ব পশ্চিমা দর্শনের নানাকথা গ্রহণ করে নেন, কর্ম দ্বারা প্রতিফলিত করেন তাদের এসব ‘নতুন-প্রাপ্ত’ চিন্তা-চেতনা বৃহত্তর সমাজে। এ থেকে উত্তরণ ছাড়া ইসলাম ধর্মবিশ্বাসভিত্তিক নীতি-নৈতিকতা তথা চরিত্রদর্শন যে সঠিক ও উত্তম শিক্ষাদান করছে, তা আর বেশিদিন ঠিকে থাকবে না। সমাজ সচেতন বুদ্ধাদের উচিৎ, এ মুহূর্তেই সচেতন হওয়া এবং সব ভুলে সমাজ বিধ্বংসী এসব দর্শন-জ্ঞানের প্রভাব থেকে জাতিকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হওয়া। এটা সময়ের দাবী। কারণ সময় অপেক্ষায় নেই- খুব শীঘ্রই অতিবেশী দেরী হয়ে যাবে। যেভাবে পশ্চিমা সমাজে হয়ে গেছে। পোপ বেনেডিক্টের উক্তিই তার প্রমাণ। আর আমাদের যারা পশ্চিমে জীবনের উল্লেখযোগ্য সময় কাটিয়েছি- এই চরম অবক্ষয়ের করুণ চিত্র ও তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে তো দিনাতিপাত করেছিই। আমরা তো ভুক্তভোগী।

চিন্তাখাদ্যঃ সবকিছু রিলেটিভ বা আপেক্ষিক হওয়ার ক্ষেত্রে আপনার ধারণা কী?

এ পর্যায়ে এসে দর্শনের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চরিত্রদর্শনের উপর [পশ্চিমা] বিভিন্ন থিওরী ও মানবজীবনে এদের প্রভাব নিয়ে আলোচনার ইতি টানতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু এই অনুসন্ধানকে আরো কিছু ব্যাপক করতে যেয়ে নিম্নে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়- যদিও খুব সংক্ষেপে, তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি। আশাকরি পাঠকরা ধৈর্যসহ এগুলো পাঠ করবেন। দর্শন স্বভাবতই খুব একটা আকর্ষণীয় বিষয় নয়- আর বলতে দ্বিধা নেই আমি নিজেও এর প্রতি আকর্ষণ বোধ করি না! এরপরও, যেহেতু পশ্চিমা দর্শনের প্রভাবে সয়লাব এখন পুরো বিশ্ব- তাই, অন্তত এর স্বরূপ জানা আমাদের জন্য কর্তব্য। অন্যথায় কোন্ মুহূর্তে যে নিজেদের পা পিছলে পড়ে- কে জানে? তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে এখন সকলের সকল দর্শন এবং সকল বিশ্বাসই সকলের নাগালের মধ্যে। দুনিয়া-আখিরাতকে অতি সহজে হারানোর এই কঠিন দিনে সতর্কতার মাত্রা শতগুণ বাড়াতে হবে। এ ধরণের চিন্তা-চেতনা থেকেই অত্র লেখাটির প্রয়াস।

৩.গ. চরিত্রদর্শনের আরো কিছু বিষয়-আসয়ঃ আমরা ইতোমধ্যে পশ্চিমা চরিত্রদর্শনের মৌলিক বিভিন্ন থিওরীর উপর আলোচনা করেছি। তবে আরো কিছু বিষয়-আসয় আছে যা জানা থাকাও গুরুত্ববহ। যেমনঃ

১. ঐশী নির্দেশ থিওরী
২. পরিণতি ও উপায়
৩. ক্যাটাগরিকেল ইম্পারিটিভ
৪. স্বর্ণালী আইন
৫. কর্ম ও উপেক্ষা
৬. পিচ্ছিল রাস্তা
৭. বীর ও কাপুরুষ
৮. ভাগ্যবান ও পরিণতি

৯. নৈতিক চরিত্র
১০. স্বর্ণালী মধ্যমপন্থা
১১. জীব-জন্তু ও তাদের প্রতি আচার-আচরণ
১২. জীব-জন্তুর অধিকার।

নিম্নে এই বারোটি বিষয় ও এদের সঙ্গে সম্পৃক্ত দার্শনিক থিওরীর উপর সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

১. ঐশী নির্দেশ থিওরীঃ পশ্চিমা দর্শন এবং বিস্তৃত সমাজেই আজকাল ‘ধর্মচিন্তা’ ও ‘ধর্ম-সংশ্লিষ্ট’ যে কোন বিষয় যেনো হাস্যস্পদ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে! দার্শনিকরা এখনো পুরোদমে ধর্মকে [আর এখানে মূলত ইয়াহুদী-খ্রিস্টবাদী ধর্ম বুঝাচ্ছে] বর্জন করেন নি। কিন্তু যেটুকু গ্রহণ করেন বলে তারা প্রচার করে থাকেন ওসব ব্যাপার মৌলিকভাবে তাদের নিজস্ব থিওরীবলীর সঙ্গে খাপ খায় বা বিরুদ্ধে যায় না- এই যা। সুতরাং আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে ইয়াহুদী-খৃস্টবাদী চরিত্রদর্শন আদৌ ইতিবাচক দিক থেকে বিবেচনা করা হয় না। তবে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী বলে দাবীদার বৃহৎ জনগোষ্ঠি আর ইয়াহুদী লবির প্রভাবশীল জালে আটকাপড়া আর্থ-রাজনীতিক ব্যবস্থা দার্শনিকদেরকে সময় সময় ধর্মবিরোধী মন্তব্য প্রচার থেকে বিরত রাখতে বাধ্য করে। অবশ্য নীতি-নৈতিকতার উপর আলোচনায় ক্ষণে ক্ষণে দার্শনিকরা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান ধর্মের সঙ্গে আজকাল ইসলামকেও সম্পৃক্ত করার প্রয়াস পাচ্ছেন। এটা শুভ না অশুভ অচিরেই হয়তো প্রকাশ পাবে। তবে তারা এখন “ইব্রাহিমী ধর্ম” ও “কিতাবী ধর্ম” হিসাবে ইসলামকে তৃতীয় স্থানে রাখতে শিখেছেন। যেমন এক দার্শনিক লিখেছেনঃ “In each of the three 'religions of the Book' - Judaism, Christianity and Islam - the system of morality is based on 'divine command': it is for God to command, humans to obey; God imposes

on its worshippers a set of moral injunctions; virtuous behaviour requires obedience, while disobedience is sin." [প্রাগুক্ত পৃ. ৫৮]।

এই একই দার্শনিক পুনরায় সন্দেহের সুরে বলেন, গড না থাকলে অবশ্য ঐশী নির্দেশ থিওরী সঙ্গে সঙ্গে বাতিল হয়ে যায়! অন্য আরেকজন বলেছেন, "No morality can be founded on authority, even if the authority were divine. [A.J. Ayer; 1968]" ডিভাইন অথোরিটি বা ঐশী কর্তৃপক্ষের উপর এরূপ সন্দেহের কারণ কি?

আমি এ ব্যাপারে অনেক চিন্তা-ভাবনা শেষে এ সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি: পশ্চিমা ধর্মগ্রন্থে অধিকাংশ মনাব-মনগড়া কথা থাকাই এর একমাত্র কারণ হতে পারে। বাইবেল ও ওল্ড টেস্টেমেন্টে- যথাক্রমে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত আসমানী কিতাব ইঞ্জিল ও তাওরাত আজকের যুগে কেনো, সে-ই আগে থেকেই মানুষ বদলে দিয়েছিল। এখন পশ্চিমারাই গবেষণা করে নির্ধিদ্বায় ঘোষণা দিচ্ছেন এই কিতাবদ্বয়ের ষাট থেকে আশি শতাংশই মানব-মনগড়া কথা! ঐশী বাণী প্রায় বিলুপ্ত- আর দিন দিন বিলুপ্তির মাত্রা বাড়ছে। এই এখন আপনি বাইবেলের দু'টি ভিন্ন কপি ক্রয় করে দেখুন। পার্থক্য দেখে অবাক হবেন। এ ক্ষেত্রে আলহামদুলিল্লাহ, ইসলাম চিরমুক্ত। কুরআন যে নাজিল হওয়ার কাল থেকে সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত আছে তা আকজের সর্বাপেক্ষা কট্টর ইসলামবিরোধীও মানতে বাধ্য। মূলত শুধু কুরআন শরীফ কেনো, পবিত্র হাদীস শরীফের মূল মতন বা ট্যাক্সট্ আজো বদলে যায় নি। বুখারী শরীফ ইমাম বুখারী যেভাবে লিপিবদ্ধ করেছিলেন সে-ই হাজার বছর পূর্বে তা আজো অপরিবর্তিত আছে। অনুরূপ অন্যান্য মূল কিতবাাদির বেলায় একই কথা সত্য। আমাদের ঐশীসূত্র এই দু'টি: কুরআন ও হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ কারণেই ইতিহাসব্যাপী আবির্ভাব

ঘটেছে অনেক মহাত্মন যুগশ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের যারা দর্শনের উচ্চ মার্গে আরোহণ করেছিলেন এবং এখনও করছেন কিন্তু একই সময় নিজেদের ধর্মবিশ্বাসের মূল আক্বাঈদী ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেন নি। হ্যাঁ, পশ্চিমা [মূলত সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যরিস্টটলিয়ান] দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিম্ন পর্যায়ে কিছু চরিত্রদর্শনভিত্তিক ক্ষেত্রে মনানৈক্য সৃষ্টি করেছিলেন বটে। ইমাম গাজ্জালী [১০৫৮-১১১১], ইবনুল আরাবী [১১৬৫-১২৪০], জালালুদ্দীন রুমী [১২০৭-১২৭৩], ইকবাল [১৮৭৭-১৯৩৮] প্রমুখের মতো ধর্মচিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁরা সফলভাবে ইসলামী দর্শনে অনুপ্রবেশিত ভ্রান্তিসমূহ খণ্ডন করে গেছেন। আর রেফারেন্স হিসাবে আধুনিক বাংলাদেশের একজন খ্যাতিমান দার্শনিকের একটি উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া যায়। তিনি হচ্ছেন উম্মাহ্‌র গৌরব মরহুম দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ [১৯০৬-১৯৯৯]।

১৯৯৯ সালে তাঁর মৃত্যুর সপ্তাহ খানেক আগের কথা। তাঁর এক নাতি সুলেখক দেওয়ান শামসুল হুদা চৌধুরী তখন আমাদের সহযোগী সাংবাদিক ও কলামিস্ট। কবি আবদুল মুকিত মুখতারের সম্পাদনায় লন্ডন থেকে প্রকাশিত ‘ইসলামী সমাচার’ নামক একটি ম্যাগাজিনে আমিও সহকারী সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলাম। শামসুল হুদা চৌধুরী সাহেব তার দাদার নিকট এক কপি ইসলামী সমাচার ম্যাগাজিন পাঠিয়ে দিলেন ঢাকায় তাঁর বাসভবনের ঠিকানায়। তিনি তখন গুরুতর অসুস্থ। ম্যাগাজিনের সাথে একখানা ঠিচি ছিলো। এতে অনুরোধ করা হয়, আমাদের প্রকাশিক এই ম্যাগাজিনখানার উপর তাঁর পক্ষ থেকে একটি মন্তব্যের। আজরফ সাহেবের মৃত্যুর মাত্র ক‘দিন পর একটি পোষ্ট আসলো। এতে ছিলো সম্ভবত দার্শনিক সাহেবের জীবনের সর্বশেষ লেখা একখানা চিঠি। তিনি মন্তব্য পাঠিয়েছেন, কিন্তু চিঠিখানা পোস্টে থাকাকালেই ইতোমধ্যে শেষ নিঃস্বাশ ত্যাগ করে নিয়েছেন।

আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম তাঁর হস্তলিপিটি পুরোটাই স্কান করে ম্যাগ্যাজিনের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ছাপিয়ে দিতে। ম্যাগাজিনের প্রশংসা শেষে মহান এই জ্ঞানতাপসের চিঠির সর্বশেষ বাক্যটি ছিলো:

"আমার জীবনের গবেষণার ফলাফল এটাই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুসৃত জীবন-পদ্ধতি তথা সুন্নাতী জীবন অনুসরণ বিশ্বের সকল মানুষের জন্য সর্বোত্তম পন্থা।"

এ ব্যাপারে আর অতিরিক্ত কিছুই বলার নেই। দার্শনিক মরহুম দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ সাহেবের জীবনভর গবেষণার ফলাফল আর কিছু নয়- সর্বযুগের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী আমাদের পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতসমূহই আমাদেরকে উত্তম নৈতিক চরিত্রের গুণাবলীতে ভূষিত করতে পারে। এর দ্বারা হতে পারে মানবজীবন স্বার্থক, উৎকৃষ্ট ও দুনিয়া-আখিরাতে সফল। ঐশীজ্ঞানের সূত্রে প্রাপ্ত মানব-জীবনের কোড-অব-কন্ডাক্ট হবে সর্বোত্তম ও নিষ্কলুষ- তাতে আশ্চর্যের কী আছে? তবে ধর্মহীন, নাস্তিকবাদীদের ব্যাপার ভিন্ন।

পশ্চিমা দার্শনিকরা সে-ই হাজার বছর পূর্ব থেকেই ইয়াহুদী-খ্রিস্টবাদী নীতি-নৈতিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে আসছেন। সময় সময় চরম বিরোধিতা করেছেন, শক্তিশালী চার্চের জেল-যুলুম-খুন-খারাবির শিকার হয়েছেন। এসব কারণেই দর্শন বা এমনকি বিজ্ঞানও আজ ধর্মের ধারে-কাছে যেতে ভয় পায়! আমি তাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি, আসুন! সত্যধর্ম ইসলামের দরোজা আপনাদের জন্য খোলা। ইতিহাস পাঠ করুন- ইসলামী দেড় হাজার বছরের ইতিহাস। দেখুন, কোথাও খুঁজে পান কি না- ইসলামী কর্তৃপক্ষ কোন বিজ্ঞানীকে জেল-জুলুম দিয়েছে, বা কোন দার্শনিককে ইতিবাচক সমালোচনা ছাড়া অন্য কোন শারিরীক কিংবা

মানসিক শান্তি প্রদান করেছে কি না। অরপদিকে ধর্মচিন্তাবিদরা রেহাই পান নি। চার মহাত্মক ইমামরাও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। কিন্তু বিজ্ঞানী বা দার্শনিক কেউ এরূপ নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বলে ইতিহাসে সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলে নি।

আমি আশাকরি পশ্চিমা চিন্তিাবিদ ও কিছু কিছু তাদের অনুসারী প্রাচ্যের বুদ্ধিবীজী-চিন্তাবিদ-দার্শনিকরাও একথা অনুধাবন করবেন যে, ইসলামের ধর্মবিশ্বাস কখনো উদারপন্থী দর্শনের বিরুদ্ধে যেতে পারে না। আর বিজ্ঞান তো বলতে গেলে ইসলামেরই উত্তরাধিকার। বলবেন, না গ্রীকরা বৈজ্ঞানিক চেতনা উপহার দিয়ে গেছেন বিশ্বসমাজকে। মানলাম, কিন্তু তাদের এই উপহারকে কারা রক্ষা ও উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন? কাদের জীবনভর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে গ্রীকদের চিন্তা-চেতনা-বিজ্ঞান-দর্শন ইত্যাদি সব ধরনের গবেষণাকে আমরা আজ হাতের নাগালে পেয়েছি? বিশ্ববাসী তা লাভ করে আধুনিক যুগের সূচনা ঘটিয়েছে। যারা এর পেছনে কাজ করেছেন জীবনভর তাঁরা ছিলেন মুসলিম মহাত্মন গবেষক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও সমাজচিন্তাবিদ। সুতরাং আবারো আকুল আহ্বান জানাচ্ছি, আসুন- ইসলামের ছায়াতলে। এখানে থেকে সত্যিকার মুক্তচিন্তার সূত্রপাত ঘটান। 'সত্যধর্ম' কখনো কোন সত্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারে না- এরূপ হওয়া স্ববিরোধী। আবিষ্কৃত সত্য হতে পারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক বা অন্য কোন সূত্রে প্রাপ্ত। ইসলাম বিনা-দ্বিধায় তা মানবে।

চিন্তাখাদ্য: আপনি কি মানবসৃষ্ট পিচ্ছিল রাস্তায় চলন্ত উদ্দেশ্যহীন দর্শনের এক বা একাধিক থিওরীকে ঐশীসূত্রে প্রাপ্ত ধর্মভিত্তিক কোড-অফ-লাইফকে বর্জন করতে পারবেন?

২. পরিণতি ও উপায় [ends and means]: ১০০ জন যাত্রীসহ একটি উড়োজাহাজ যান্ত্রিক গোলযেগোর কবলে পড়েছে। ইঞ্জিনে আগুন লেগেছে। পাইলোট কিছুতেই একে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছেন না। দ্রুত ভূপাতিত হয়ে ধ্বংস হবে। মারা যাবেন ক্রুসহ সকল যাত্রী। নিম্নে খুব ঘনবসতি একটি জনপদ। হাজার হাজার মানুষ বাঁচানো যায় কিভাবে? জনপদের লোকদেরকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার সময় হাতে নেই। এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষ কি করবে? উড়োজাহাজটি মিসাইল দ্বারা আকাশে থাকতেই ধ্বংস করে জনপদের বহু লোকের প্রাণ বাঁচাবে? না ভূপাতিত হতে দিয়ে হাজার হাজার মানুষের জীবন নিভে যেতে সুযোগ দেবে? আপনি দায়িত্বে থাকলে কি করবেন?

সিয়ামিজ জময কি, সবাই জানেন। এক মাসের ভেতর উভয় শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হবে নিশ্চিত। তবে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে একটিকে বাঁচানো সম্ভব? অপরটি মারা যাবে নিশ্চিত। আপনি কি করবেন? জমজের মা-বাবা যদি রাজী না হন, তারপরও একটিকে বাঁচাতে যেয়ে অপরটিকে হত্যা করতে রাজী হবেন কি?

টার্মিনাল রোগী ‘ক’ এক সপ্তাহের ভেতর মৃত্যুবরণ করবেন বলে সকল ডাক্তারদের বিশ্বাস। তার হৃদযন্ত্র ও কিডনি যথাক্রমে রোগী ‘খ’ ও রোগী ‘গ’ এর জন্য উপযুক্ত। উভয়ের এই যন্ত্র দু’টি নষ্ট হয়ে গেছে। তারা এক কিংবা দু’দিনের মধ্যে অর্থাৎ রোগী ক এর পূর্বে মৃত্যুবরণ করবে। কিন্তু ঐ হৃদযন্ত্র ও কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করলে বাঁচার চান্স আছে তাদের। এমতাবস্থায় কি করা যায়? এ দু’জনকে বাঁচাতে যেয়ে রোগী ক কে হত্যা করা সঠিক হবে কি? তার অনুমতি থাকলে বা না থাকলে দু’ব্যক্তির স্বার্থে এক ব্যক্তির প্রাণ দু’দিন পূর্বে হরণ করা কি ঠিক হবে?

আরো একটি সিনারিও। আপনি ও আরো ক'জন ছোট্ট একটি বিমানে কোথাও যাচ্ছেন। বিরাট এক মরুভূমির উপর দিয়ে যাওয়ার সময় বিমানখানা ভূপাতিত হলো। আপনারা ক'জন প্রাণে রক্ষা পেলেন কিন্তু অনেকেই মারা গেল। এই বিশাল মরুভূমি পায়ে হেটে পাড়ি দিতে অন্তত মাস খানেক লাগবে। ইতোমধ্যে আপনারা ক্ষুদার্থ হয়ে মারা যাবেন। তবে সাহায্য আসতে পারে। অপর মৃত যাত্রীদের একজনের মাংস খেলে সকলে অন্তত এক সপ্তাহ অতিরিক্ত বাঁচতে সমর্থ হবেন। আপনারা কি করবেন? নিজের সাথী ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করবেন?

আর বলবো না। ব্যক্তিগতভাবে এ ধরনের 'কঠিন এবং কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের' কোন সমস্যায় পড়ি নি। হয়তো পাঠকদের কেউও পড়েন নি। কিন্তু বিশ্বাস করুন উক্ত চারটি বর্ণনা মুতাবিক সমস্যা ও অনুরূপ সমস্যায় মানুষ অতীতে পড়েছেন এবং ভবিষ্যতেও পড়তে পারেন। এরূপ সিটুয়েশনে কোন্ সিদ্ধান্তটি নীতিসম্মত বা শিষ্টাচারের অনুকূলে হবে এ নিয়ে দার্শনিকদের চিন্তার সীমা নেই। তাদের প্রশ্ন- পরণতি শুভ হলে উপায় বিবেকসম্পন্ন হবে কি না? [does the end jusify the means?]। অর্থাৎ এক বা একাধিক অনৈতিক কাজ দ্বারা শুভ ফলাফল লাভ কি নীতি-নৈতিকতাসম্পন্ন হবে?

চরিত্রদর্শনে উপরোক্ত প্রশ্নটি গুরুত্বহ। কিন্তু আজ পর্যন্ত দার্শনিকরা সঠিক কোন জবাব খুঁজে পান নি। এর মূল কারণ হলো, প্রশ্নটি মানুষের জীবন-মরণ নিয়ে। এরূপ অবস্থার সম্মুখীন মানুষ অহরহ হয়ে থাকে। সুতরাং স্বভাবতই দার্শনিকদের মধ্যে এ সম্পর্কে কোন মতৈক্য হয় নি। একদল বলেন: কোন কর্ম সঠিক না অঠিক তা নির্ভর করে এর দ্বারা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভ হচ্ছে কি না। অর্থাৎ end jusify the means- এই থিওরীতে তারা বিশ্বাসী। এই থিওরীর নাম কনসেকুয়েন্টিয়েলিজম [consequentalism] আমরা ইতোমধ্যে এদের সম্পর্কে উল্লেখ

করেছি। এ ব্যাপারে রুশ লেখক লিও ট্রসকির [১৮৭৯-১৯৪০] একটি উক্তির উদ্ধৃতি তুলে ধরা যায়। তিনি বলেনঃ The end may justify the means so long as there is something that justifies the end - Leo Trotsky, 1936।

ট্রসকির উপরোক্ত মন্তব্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম দৃষ্টিতে অনুমিত হয় এটা কনসেকুয়েন্টিয়েলিজমের সমর্থনে বলা হয়েছে। কিন্তু একটু চিন্তা করলে ধরা পড়বে যে, বাস্তবে ট্রসকির কথাটি ভিন্ন। যে কোন সমস্যার সমাধান তো করতেই হবে। কিন্তু তা করতে যেয়ে যখন কোন কর্ম পম্পাদন অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায় আর তা নিজেই যদি স্বাভাবিক নীতি-নৈতিকতা বিরুদ্ধ ব্যাপার হয়, তখন ফাইনেল সিন্ধান্ত নিতে হবে পরণতি সঠিক কি না সেটা বিবেচনায় এনে। অর্থাৎ যে ফলাফল আসবে তা-ও কি বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন? সেটা দেখতে হবে। অথচ কনসেকুয়েন্টিয়েলিজম বলে, যে আকাঙ্ক্ষা করা হয়েছে তাতে পৌঁছতে অনৈতিক কর্ম সাধন অবস্থার প্ররিপ্রেক্ষিতে বৈধ। যেমন আমেরিকার সৈন্যরা ইরাকের একটি ঘনবসতি অঞ্চলে বোমা মেরে কিছু তথাকথিত ‘টেরোরিস্টদের’ হত্যা করলেন- সাথে সাথে ধ্বংস করে দিলেন উক্ত ঘনবসতি জনপদ এবং হত্যা করলেন অসংখ্য নির্দোষ নারী-শিশু-কিশোর-কিশোরীসহ অনেককে। কনসেকুয়েন্টিয়েলিজম থিওরীই হলো তাদের ডিফেন্স। তারা বলবে, এ হলো যুদ্ধের কল্যাটারেল ডেমেজ! [collateral damage] -এ থেকে উত্তরণের কোন উপায় নেই। অনৈতিক, সমাজ বিধ্বংসী সন্ত্রাসীদের হত্যা করতে যেয়ে এরূপ কল্যাটারেল ডেমেজ গ্রহণ করতে হবে! অর্থাৎ ‘এন্ড জাস্টিফাই দ্যা মিন্‌স’। পাঠক, আপনি কি মনে করেন? অবশ্য সত্যিকার সন্ত্রাসীরাও অনুরূপ কর্ম করে। তাদের বিশ্বাস ও উদ্দেশ্য হাসিলে তারা সাধারণ নির্দোষ মানুষকে বোমা মেরে হত্যা করতে মোটেই দ্বিধা করে না।

অপরদিকে বিপরীত সীমায় যেতে প্রস্তুত আরেকদল দার্শনিক। তারা বলেন, ভবিষ্যতের কোন অতিরিক্ত বা এমনকি বিরাট ক্ষতি এড়াতে কোন জঘন্য নীতি-বিরুদ্ধ ক্রিয়া বর্তমানে সম্পাদন বৈধ হবে না। যেমন বিমানকে গুলিকরে ভূপাতিত করা, সিয়ামিজ জমজের উপর অস্ত্রোপচার, টার্মিনেল রোগীকে হত্যা এবং নিজের ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এসব কাজ মৌলিকভাবে মানবিক নীতি-নৈতিকতাবিরুদ্ধ। এই দর্শনকে বলে, deontologist system। তাদের অবস্থান ও সিদ্ধান্ত সমর্থনযোগ্য করতে যেয়ে বলেন, একদল [সংখ্যায় বেশী হলেও] মানুষকে বাঁচাতে যেয়ে একজনও সম্পূর্ণ নির্দোষ মানুষ হত্যা কখনো নীতিসম্পন্ন হতে পারে না। ভবিষ্যতের ঘটনা কি হবে তার নিশ্চয়তা নেই। এমনও হতে পারে, বিমানটি জনপদে ভূপাতিত হলেও কোন বিশেষ কারণবশত মানুষ মৃত্যুবরণ না-ও করতে পারে। কিংবা বিমানের এক বা একাধিক যাত্রী প্রাণে রক্ষা পেতেও পারেন। মোটকথা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা নিশ্চিতভাবে কিছু সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। আমরা যেভাবে ভবিষ্যৎ ঘটনবালী হওয়ার কথা ভাবি, অনেক ক্ষেত্রে সেরূপ হয় না।

চিন্তাখাদ্যঃ আজকের যুগে 'কল্যাটারেল ডেমেজ' পশ্চিমা দুনিয়াসহ অধিকাংশ গভর্ণমেন্ট গ্রহণ করে নিয়েছেন। আপনি কি মনে করেন, এটা ঠিক? যদি না হয় তাহলে ডিওন্টোলজিকেল সিস্টেম কি আপনার নিকট অতিরিক্ত গ্রহণযোগ্য- না অন্য কোন তৃতীয় উপায় আপনার জানা আছে?

৩. ক্যাটাগরিকেল ইম্পারিটিভ [categorical imperative]ঃ আমরা জীবনচলার পথে অনেক সিটুয়েশনের সম্মুখীন হই- যেখানে মিথ্যা না সত্য বলবো তা আমাদের ভাবিয়ে তুলে। মনে করুন, আপনি নিশ্চিতভাবে জানেন, শরীফ সিদ্ধান্ত নিয়েছে হাসানকে হত্যা করবে। আপনি হাসানের সঙ্গে দেখা করে তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছেন। রাস্তায় আপনি শরীফের সাক্ষাৎ পেলেন। সে খুব রাগান্বিত। আপনাকে জিজ্ঞেস করলো, হাসান বাড়িতে আছে কি? আপনি কি জবাব দেবেন? যদি বলেন, আছে, তাহলে এটা নিশ্চিত, শরীফ সেথায় যেয়ে হাসানকে খুন করবে। আর যদি বলেন, আমি তার বাড়িতে গিয়েছিলাম, সে সেখানে নেই- তাহলে হাসান রক্ষা পেয়ে যায়। সুতরাং আপনি মিথ্যা বলে হাসানকে বাঁচাবেন, না সত্য বলে সত্যবাদী হবেন?

উক্ত অবস্থায় সাধারণত আমরা হাসানকে বাঁচাতে যেয়ে মিথ্যা বলতে রাজী হবো অবশ্যই। কিন্তু দর্শনে এরূপ সিটুয়েশনে সত্য-মিথ্যা পাল্লায় তুলে মাপা হয়। যেমন, দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট [১৭২৪-১৮০৪] বলেছেন, এসব ক্ষেত্রেও মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া সঠিক হবে না! মিথ্যা না বলা, তার মতে এথিক্সের একটি মৌলিক প্রিন্সিপাল। একেই বলে, ক্যাটাগরিকেল ইম্পারিটিভ [শর্তহীন নির্দেশ]। ফলাফলভিত্তিক কথা বলা কখনো গ্রহণযোগ্য নয়। কান্টের এই সিদ্ধান্ত প্রথম প্রতিক্রিয়ায় সবার নিকট অদ্ভুত ও কঠোর মনে হতে পারে। কিন্তু জীবন-মরণ সিটুয়েশন ছাড়াও 'অনেকটা কম খারাপ ফলাফল বয়ে আনে' এরূপ ক্ষেত্রেও কি আপনি মিথ্যার আশ্রয় নেবেন? কান্ট বলেছেন, আমরা যদি মিথ্যা বলাকে মৌলিকভাবে নীতিবিরুদ্ধ বলে মেনে না নেই তাহলে, অজুহাত দেখিয়ে মানুষ তার স্বার্থ উদ্ধারে মিথ্যা বলার দিকে ঝুঁকে পড়বে। আর এমনটি হচ্ছে আজকের বিশ্বসমাজে।

কান্টিয়ান এথিক্স-এর কোণ্‌-ফলক হলো উক্ত ক্যাটাগরিকেল ইম্পারিটিভ থিওরী। তিনি এর ব্যাখ্যা দিতে যেয়ে এটা যা নয়, তা বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। যেমন, মনে করুণ আপনাকে কি করতে হবে তার উপর একটি নির্দেশ আমি জারী করলাম [an imperative] এই বলেঃ "ধূমপান বন্ধ করুন!"। এখন, আমি যদি চাই- এই নির্দেশের সঙ্গে একাধিক শর্তও জুড়ে দিতে পারি, যেমনঃ "যদি তোমার জীবন ধ্বংস করতে না চাও", কিংবা "যদি তোমার টাকা উড়াতে না চাও!"। অবশ্য আপনি যদি নিজের স্বাস্থ্য ও টাকা সম্পর্কে পরওয়া করেন না- এই নির্দেশের ওজন বা গুরুত্ব মোটেই থাকবে না। সুতরাং মানা না মানা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। অন্যদিকে 'ক্যাটাগরিকাল ইম্পারিটিভ' বা শর্তহীন নির্দেশ হলো, এর সঙ্গে কোন 'যদি' সম্পৃক্ত থাকবে না। যেমনঃ "মিথ্যা বলবে না!" ও "মানুষ হত্যা করবে না!" ইত্যাদি। এসব নির্দেশ সার্বজনীন ও কোন কাল্পনিক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। নিজের ব্যক্তিগত কোন ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা সফল না বিফল হবে, তা চিন্তা না করে এগুলো মানতে হবে। এটা মানা একান্ত কর্তব্য কোন কন্ডিশন ছাড়াই। এ ধরনের শর্তহীন নির্দেশই চারিত্রিক আইনের আওতাভুক্ত। কাল্পনিক বা কন্ডিশনাল নির্দেশ কিন্তু ভিন্ন।

ইমানুয়েল কান্টের মতে, প্রত্যেক ক্রিয়ার মূলে থাকে এটি সম্পাদনের একেকটি বিশেষ আইন- যাকে তিনি মেক্সিম [maxim] বলেছেন। দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যাপারটি পরিষ্কার হবেঃ আমরা একটি মেক্সিমের প্রস্তাব দিতে পারি যে, মিথ্যা বলার অনুমতি থাকতে পারে। কিন্তু মিথ্যা বলা সেখানেই সম্ভব কিছুটা সত্যবলাও যেখানে অবশিষ্ট আছে। অন্যথায় সকলে মিথ্যা বললে- কেউ কাউকে বিশ্বাস করবে না! সুতরাং এই কারণে 'মিথ্যা বলার এই 'ইচ্ছা' সার্বজনীন আইনে রূপান্তর হবে স্ব-পরাজিতমূলক এবং ক্ষেত্রবিশেষে ইন্দ্রিয়ানুভূতির দিক থেকে যুক্তিহীনও বটে। অনুরূপ চুরির উদ্দেশ্য বা পূর্ব-সিদ্ধান্ত হলো অধিক সম্পদশালী হওয়া- সুতরাং সম্পদের

পুরো ধারণাই ধ্বংস হবে যদি সকলে চুরি করে। সুতরাং কান্ট তার থিওরীর প্রথম আইন ব্যক্ত করেছেন নিম্নরূপঃ

১. যে নীতি থেকে আপনি একই সময় সার্বজনীন আইন সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন, একমাত্র সেই নীতি অনুযায়ী কর্মসাধন করুন।

তার ক্যাটাগরিকেল ইম্পারিটিভ থিওরীর দ্বিতীয় আইনটি হলোঃ

২. নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ কিংবা অপরের স্বার্থে হোক, তোমার কর্ম যেনো কখনো মানবতার সার্বিক স্বার্থবিরোধী না হয়। এটা যেনো শুধুমাত্র সাধারণ উপায়-অবলম্বনের মাঝে কখনো সীমাবদ্ধ না থাকে, সর্বদাই যেনো শেষ ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে হয়।

ইমানুয়েল কান্ট অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে এই থিওরীর জন্ম দেন। এর মূল মাহাত্ম্য মানবতাবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। নিজের স্বার্থে আমরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারি- কিন্তু এর দ্বারা অপরের ক্ষতি বা পুরো মানবতার ক্ষতি হবে- এটা কান্ট মানেন নি। ফলে তার এই চরিত্রদর্শন এখনো গ্রহণযোগ্যতা হারায় নি- যদিও আজকের সমাজে এই থিওরীর বিকাশ অত্যল্পই ঘটছে। এটা দুঃখজনক।

চিন্তাখাদ্যঃ আপনি কি যে কোন মূল্যে নীতি-নৈতিকতাবিরোধী কোন কাজ করতে অস্বীকার করবেন? খাস করে এই কাজটি দ্বারা ব্যক্তিগত স্বার্থ যদি উদ্ধার হয় আর তা সার্বিকভাবে মানবতার জন্য ক্ষতিকর হয়- আপনি কি তখনো বৃহত্তর মানবতার স্বার্থে নিজেরটা জলাঞ্জলি দিয়ে কাজটি করা থেকে বিরত থাকবেন?

৪. স্বর্ণালী আইন [golden rule]: তখন আমেরিকার সমাজে বর্ণবাদী টেনশন তুঙ্গে। সাদা-কালো সংঘাতে পুরো সামাজিক ফেব্রিক ছিড়ে যায়, এরূপ অবস্থা। মারামারি হানাহানি, বিক্ষোভ-মিছিল নিত্যদিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশেষে ১৯৬৩ সালের জুন মাসে প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জন.এফ, কেনেডি [১৯১৭-১৯৬৩] মুখ খুললেন। জাতির উদ্দেশ্যে তিনি এক স্মরণীয় ও প্রভাবশীল ভাষণ দান করেন। তার এ বক্তব্যের সারাংশ:

"কেন্দ্রীয় প্রশ্ন হলো, সকল আমেরিকানকে সমধিকার ও সম-সুযোগ দেওয়া যাবে কি না। নিজেদের প্রতি যেরূপ ব্যবহারে আমরা সন্তুষ্ট ঠিক সেরূপ ব্যবহার আমাদের প্রতিবেশী আমেরিকানদের প্রদান করতে আমরা রাজী কি না। পাবলিকদের জন্য খোলা কোন রেস্টুরেন্টে যদি একজন আমেরিকান খেতে পারে না কারণ তার চামড়া কালো, তিনি যদি তার ছেলেমেয়েকে উত্তম পাবলিক স্কুলে পাঠাতে না পারেন, তিনি যদি পাবলিক অফিসারদের ভোটদান করতে পারেন না, যিনি হবেন তারই প্রতিনিধি, মোটকথা, আমরা যে পূর্ণাঙ্গ ও স্বাধীন-সুন্দর জীবনভোগের আকাঙ্ক্ষী তা যদি তিনি ভোগ করতে না পারেন, তাহলে আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে, ঐ ব্যক্তির স্থান দখল করতে নিজের চামড়ার রঙ বদলাতে প্রস্তুত? আমাদের মধ্যে কে আছে, যে এসব ব্যাপারে বিলম্ব হোক তা মানতে ধৈর্যশীল হবেন?"

কেনেডির এই আবেগপূর্ণ বক্তব্যে মানুষের বোধোদয় হয়েছিল। আমেরিকান সমাজ ক্রমে কালো বা রঙিন চামড়ার সকলকে আপন হিসাবে মেনে নেয়। ফলস্বরূপ আজ [এই লেখার সময় - ২০১৩ সালের শুরুতে] দ্বিতীয়বারের মতো নেতৃত্বের আসনে আসীন হতে পেরেছেন কালো [আসলে উজ্জ্বল বাদামী!] চামড়ার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। মাত্র এক দশক পূর্বেও রাজনীতিক বুদ্ধা গবেষকরাও যা কল্পনা করতে পারেন নি।

প্রেসিডেন্ট কেনেডির এই বক্তৃতার মূলে যে ফিলোসফি বা দর্শন সক্রিয় ছিলো তাকে ‘গোল্ডেন রোল’ [golden rule] বলে।

পশ্চিমা এক দার্শনিক গোল্ডেন রুলের প্রবর্তক হিসাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সনাক্ত করার সাহস দেখিয়েছেন! তাঁর গ্রন্থে এই আইনটির ব্যাখ্যাদান কালে পাশেই একটি হাদীসের ইংরেজি অনুবাদ এভাবে তুলে ধরেন:

“'Hurt no one so that no one may hurt you.' Muhammad [SAWS], c.630”

উপরোক্ত কথাগুলো পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মভিত্তিক চরিত্রদর্শনের স্বর্ণালী আইন। বিষয়টি স্পষ্ট। এরপরও একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করলে ভালো হয়। আমরা সকলে নিজেদের ব্যাপারে যদি সর্বদা এভাবে ভাবি: যে আর্থ-সামাজিক অবস্থানে আমি আছি বা আল্লাহ পাক আমাকে রেখেছেন তা-ই আমার জন্য যথেষ্ট। কারণ সমাজে আমার থেকেও দুর্ভাগ্য ব্যক্তিদের অভাব নেই যারা আমার মতো তেমন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অপরদিকে আমার থেকেও যারা উচ্চ সামাজিক অবস্থানে আছেন সেদিকে তাকানোর প্রয়োজন আমার নেই- কারণ আমি নীচের স্তরের লোকটি থেকেও আরো নীচে থাকতে পারতাম। মোটকথা, আমি যেহেতু সে-ব্যক্তির তুলনায় ভালো অবস্থানে আছি তাই এটাই আমার জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার। এরূপ মন-মানসিকতাসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা যে সমাজে যতো বেশী হবে সে সমাজে ততো বেশী শান্তি বিরাজ করবে। অপরের ধন-সম্পদ, যশ-খ্যাতি ও সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রতি ‘হিংসাতুর’ দৃষ্টিতে না তাকালে মানুষের মনে যেমন প্রশান্তি অনুভব হয়, তেমনি পুরো সমাজের জন্যও তা কল্যাণকর হবে নিঃসন্দেহে।

চিন্তাখাদ্য: আজকের সমাজে মানুষ স্বর্ণালী আইন কতটুকু মানে বলে আপনি মনে করেন?

৫. কর্ম ও উপেক্ষা [acts and omissions]: জীবনচলার পথে আমরা কিছু কিছু অবস্থা বা সিটুয়েশনের শিকার হই যখন ক্রিয়া দ্বারা দু'টি ক্ষতির একটি হবেই। এমতাবস্থায় ক্রিয়া বা কর্মটি থেকে বিরত থাকাই কি সঠিক হবে? একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি: এক গুহায় ৬ জন লোক আটকা পড়েছেন। গুহার ভেতর পানি জমে যাচ্ছে দ্রুত। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সকলের সলিল সমাধি হবে। গুহার পাশে আরেকটি খাল। ওখানে আটকা পড়ে গেছেন দু'ব্যক্তি। এরা ঐ ছয় জনের সাথী ছিলেন। দুর্ঘটনার সময় তারা খালে পড়ে যান। নিজে নিজে খাল থেকে উঠে আসার কোনো পথ খোলা নেই। সুতরাং উভয় দলই বিরাট সমস্যায় পতিত। আপনি উদ্ধারকর্মীদের নেতা। সবকিছু পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন, গুহার ভেতরের মানুষগুলোকে বাঁচাতে চাইলে ঐ খাল দিয়ে পানির স্রোত পাঠিয়ে দিতে হবে। কিন্তু এরূপ করলে খালের ভেতর আটকা পড়া দু'ব্যক্তির প্রাণ যাবে। এ দু'ব্যক্তিকে আপনি ধীরে-স্থিরে উদ্ধার করতে পারবেন ঠিকই, কিন্তু ঐ ছ'জনকে উদ্ধার করতে হলে এক্ষুণি খালের দিকে পানির গতি বদলে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। মোটকথা, আপনি এমন এক সমস্যায় পড়লেন, একদলকে বাঁচাতে উদ্ধারকাজ চালনা করলেই অপরদলের মৃত্যু অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় আপনি কি করবেন? ৬ জনকে বাঁচাতে যেয়ে [যা করা সাধারণত প্রথমেই আপনার মন বলবে] বাকী দু'জনের প্রাণকে বিসর্জন দিতে পারবেন কি? ওদেরও তো বেঁচে থাকার পূর্ণ অধিকার আছে। অপরদিকে এ দু'জনকে বঁচাতে চাইলে তাদেরকে উদ্ধার করতে পারেন। কিন্তু ইতোমধ্যে পানির মাত্রা গুহার ভেতর এ পরিমাণ বাড়বে যে, ঐ ৬ ব্যক্তির মৃত্যু অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে। আপনি কি করবেন, কর্ম থেকে বিরত থাকবেন, নাকি যে কোন একদলকে বাঁচাবেন অপরদলকে উপেক্ষা করে?

অনাকাঙ্ক্ষিত এক বিরাট সমস্যা। যার কোন সহজ সমাধান নেই। মূলত এরূপ সিটুয়েশন চরিত্র দর্শনের উপর গবেষক বড় বড় চিন্তাশীলদেরও ঘামিয়েছে। দু'টি কাজের একটি মাত্র সম্ভব: ১. আপনি যে কোন পার্টিকে বাঁচাবেন, আর না হয় ২. কিছুই করবেন না, ফলে ৬ ব্যক্তিকে মৃত্যুর হাতে ঠেলে দিবেন। দার্শনিকরা এ ব্যাপারে কি বলেন?

স্বভাবতই এই কার্য-উপেক্ষা সমস্যা চিন্তাশীলদের দু'টি ভাগে বিভক্ত করেছে। একদল মনে করেন, কার্য দ্বারা শেষ ফলাফল কী হয় তা দেখতে হবে। যদি ২ জনের তুলনায় ৬ জনের জীবনের মূল্য বেশী মনে করা হয়- আর তারা তা-ই মনে করেন, তাহলে অবশ্যই বসে থাকলে চলবে না- পানির গতি খালের দিকে পরিবর্তন করে গুহার ভেতরের লোকদেরকে বাঁচাতে হবে। অন্যদল মনে করেন, আমাদেরকে 'প্রভুর অভিনয়' করতে নেই। কে বাঁচবে আর কে মরবে তা প্রভুর ইচ্ছাধীন- আমাদের পক্ষে এ সিদ্ধান্তগ্রহণ মোটেই ঠিক হবে না। প্রভুর যদি ইচ্ছা হয়, উভয় দলকে বাঁচাবেন, না হয় এক দলকে রক্ষা করবেন আর অপরদের মৃত্যু হবে। সুতরাং এরূপ সমস্যার সম্মুখীন হলে, উদ্ধার-পার্টি সময় মতো দুর্ঘটনা স্থলে পৌঁছুতে পারে নি, এই অজুহাত করতে হবে! অবশ্য আমরা এখানে জীবন-মরণ সমস্যার কথা বলছি। সর্বক্ষেত্রে এই আইন গ্রহণযোগ্য- তা তো অবশ্যই নয়। দার্শনিকদের কেউ কেউ যুক্তি দেন, কোন কিছু না করাও বাস্তবে 'প্রভু অভিনয়'! কারণ আমাদের যেমন কোন কিছু করার ক্ষমতা আছে, তদ্রূপ না করার ক্ষমতাও আছে। কার্য করে যে ফলাফল আমরা আশা করি-, তা না করে তার সম্ভাবনা থেকে নিজেরাই তো বঞ্চিত করলাম ওসব মানবসন্তানদের। সুতরাং সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে কিছু করাও হয়তো আমাদের জন্য 'প্রভু-প্রদত্ত অভিনয়' হবে- এই যা।

এই উভয়কুল থেকে রক্ষার উপায় কি? বাস্তবে নেই। কারণ পক্ষে-বিপক্ষে উভয়দিকেই শক্তিশালী যুক্তি বিদ্যমান। আমরা আরেকটি দৃষ্টান্ত

তুলে ধরতে পারি। আধুনিক যুগে 'আত্মরক্ষা' আইনী সমর্থন পেয়েছে পৃথিবীর সকল দেশেই। 'জান-বাঁচানো ফরজ' একটি কথা আছে। ইংরেজিতে একে বলে সেলফ ডিফেন্স। আপনাকে কেউ যে কোন কারণে হোক আক্রমণ করলো- তখন আত্মরক্ষার জন্য হামলাকারীকে হত্যা পর্যন্ত করা আপনার জন্য আইনের দৃষ্টিতে বৈধ। কিন্তু এখানেও মূলত একটি জীবন রক্ষার্থে অপরটি বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে। তাহলে বৈধতার কারণ কি? বা এ ব্যাপারে কোনো দার্শনিক তো নয়ই সমাজচিন্তাবিদ কিংবা যে কোন সচেতন নাগরিক মুখ খুলেন না কেন? ব্যাপারটি আসলে 'ইচ্ছা' বা নিয়তের অন্তর্ভূক্ত। মুসলিম দার্শনিকরা অনেক আগেই আত্মরক্ষাকে চরিত্রদর্শনের আওতাভুক্ত এনে গবেষণা করেছেন এবং সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, জান-বাঁচানো ফরয। হামলাকারীর ইচ্ছা বা নিয়ত যদি হত্যা হয়- তাহলে অবশ্য আত্মরক্ষার্থে হত্যা করাও বৈধ হবে। কিন্তু আপনাকে কিল-ঘুষি মারতে আসলো- বা লাঠি দিয়ে আঘাত হানতে উদ্যত হলেই আপনি তাকে গুলি করে হত্যা করবেন, তা কখনো সেলফ ডিফেন্সের আওতাভুক্ত হতে পারে না। পশ্চিমা দার্শনিকরা আত্মরক্ষার দার্শনিক গবেষক হিসাবে ঈসায়ী ত্রয়োদশ শতকের খ্রিস্টবাদী দার্শনিক সেন্ট থমাস একুইনাস [১২২৪/২৫-১২৭৪] -এর কথা উল্লেখ করে থাকেন। তিনি স্বরচিত 'Summa Theologica' গ্রন্থে বলেছেন:

[ভাবানুবাদ] "দু'টি ফলাফল একটি কার্যের দ্বারা আসতে পারে, এতে দোষ নেই, যদি একটিমাত্র ফলাফল লাভের নিয়ত থাকে, আর অন্যটি নিয়তের আওতাভুক্ত না হয়। আত্মরক্ষার ক্রিয়া থেকে দু'টি ফলাফল বেরিয়ে আসতে পারে: প্রথমটি হলো একজনের জীবনরক্ষা আর অপরটি হামলাকারীর জীবননাশ। সুতরাং এই কাজটি যেহেতু নিজের জীবনরক্ষার্থে হয়েছে, এটা বে-আইনী নয়। কারণ, এটাই স্বাভাবিক- কেউ কি কখনো স্বেচ্ছায় এভাবে আক্রমণকারীর হাতে জীবন দিতে চাইবে? অথচ এটাও বলতে হবে, যদিও ভালো নিয়ত থাকে না কেন, যে কোন কার্য বে-

আইনীও হতে পারে যদি তা অবশেষে সীমাতিক্রম করে বসে। কেউ যদি আত্মরক্ষার্থে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভায়লেন্সে জড়িত হয়, এটা বে-আইনী হবে। আর সে যদি সীমার ভেতর থেকে আক্রমণকারীর হামলার প্রতিরোধ করে তাহলে তা আইনসম্মত হবে।"

চিন্তাখাদ্যঃ কিছু করা বা না করা নির্ভর করে কিসের উপর? জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে এটম বোমা নিক্ষেপ ও হাজার হাজার মানুষ হত্যা কী কখনো নীতিসম্মত হতে পারে? আমেরিকার প্রয়াত প্রেসিডেন্ট ট্রুমেন [১৮৮৪-১৯৭২] তো অনুরূপ প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, এটা এমন কোনো এক সিদ্ধান্ত ছিলো যার পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করা জরুরী ছিলো না! এরূপ গণহত্যা গ্রহণযোগ্য হওয়ার একটি মাত্র অজুহাত আছে যা পশ্চিমা দার্শনিকরা দিয়ে থাকেন, তাহলোঃ এই বোমাদ্বয় বিস্ফোরণের ফলে খুব দ্রুত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। অন্যথায় সম্ভবত কয়েক গুণ বেশী হত্যাযজ্ঞের প্রয়োজন দাঁড়াতো যদি জাপানকে আমেরিকা ও মিত্র ফোর্স বলপূর্বক দখল করে নিতে হতো। আপনি কি এরূপ অজুহাতকে গ্রহণ করতে পারেন?

৬. পিচ্ছিল রাস্তা [slippery slope]: চারিত্রিক উচ্চ-ভূমিকে স্বভাবত অনেক টিলা ঘিরে রাখে। আর টিলা থেকে অবতরণের বহু রাস্তা আছে- তা সবই পিচ্ছিল। এছাড়া চলতে খুবই কষ্টকরও। দর্শনে এই নৈতিক পিচ্ছিল রাস্তার ধারণা অতি সহজ। আপনি যদি কোন ক্ষতিকর বা মৃদু অভিযোগপূর্ণ কার্য- 'ক' সম্পাদনের অনুমতি দেন, তাহলে এ থেকেই পরবর্তীতে আরো বেশী ক্ষতিকর এবং সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত কার্য - 'গ' এর প্রচলন শুরু হবে। এটার নামই স্লিপারি স্লোপ। সকরার বা উচ্চ পর্যায়ের ক্ষমতাধর ব্যক্তি সংস্থা বা পুলিস ফোর্স থেকে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং সকল সচেতন নাগরিকদেরকে এ ব্যাপারে সজাগ থাকা চাই। কোনো সমাজবিরোধী কিংবা নীতি-নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপ যাতে পিচ্ছিল রাস্তার ভিকটিমে পরিণত না হয় তা সঠিকভাবে পাহারা প্রত্যেক নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব। আর এই নাগরিকদের পছন্দের নেতা তথা সরকারী প্রতিনিধিদেরও প্রধান দায়িত্ব এটি। দেশ বা জনগোষ্ঠির শান্তি, শৃঙ্খলা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তা এই স্লিপারি স্লোপকে নিয়ন্ত্রণাধীন রাখার উপর অনেকটা নির্ভরশীল। স্লিপারি স্লোপে চলতে দিলে পরিণতিতে কী হতে পারে তার কয়েকটি 'গরম-ইস্যু' বলে খ্যাত দৃষ্টান্ত নিম্নে তুলে ধরছি। বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবনে এগুলো সহায়ক হবে বলে আশারাখি।

১. মৃত্যুপথযাত্রী রোগীকে স্বেচ্ছামরণের অনুমতি প্রসঙ্গ: টার্মিনেলী রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে স্বেচ্ছায় জীবননাশের অনুমতি প্রদান করলে ক্রমান্বয়ে এই ক্রিয়াটি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে এই ভেবে যে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরকে এভাবে 'শান্তিপূর্ণ উপায়ে' যেতে দিলে তারা যে স্থান শূন্য করবেন তা-তে নতুন প্রজন্মের জন্য উপকারী হবে। 'euthanasia' নামক এই প্রাকটিস নিয়ে পশ্চিমা দুনিয়ায় গরম-গরম সংলাপ চলছে। দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হয়েও

নিজেদের ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবে তা হবে 'আত্মহত্যাকে' অনুমতি প্রদানের সমিল যা কোন সমাজই গ্রহণ করে না।

ব্যাপারটি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে পরিষ্কার হতো যে, মানুষের দেহ ও প্রাণ মূলত তার নিজের নয়, এর মালিক আল্লাহ তা'আলা। হ্যাঁ আধুনিক মেডিসিনের ব্যবহার বৈধ। রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তির ওয়াসিলা অন্বেষণ কখনো নীতি-নৈতিকতাবিরোধী হতে পারে না। কিন্তু ইনজেকশন দ্বারা তথাকথিত 'টার্মিনেলী রোগাক্রান্ত' ব্যক্তিকে ডাক্তারের পরামর্শ বা তার নিজের অনুমতিক্রমে 'হত্যা' করার অধিকার ইসলাম বৈধ মনে করে না। বাস্তবে 'টার্মিনেলী ইল' [terminally ill] নামক ধারণাটি মূলত অমূলক। নিজেই অনেক টার্মিনেলী ইল বা নিশ্চিত মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তি দেখেছি যাদের 'হায়াত' ডাক্তার নির্ধারণ করেছেন এক মাস বাকী- কিন্তু দেখা গেছে ঐ ব্যক্তি বছরের পর বছর জীবিত আছেন বা থেকে মৃত্যুবরণ করেছেন। এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে। তাহলে কাউকে এই ধারণার আওতাভুক্ত এনে হত্যা করা হবে- তা কিভাবে বৈধ হতে পারে? আরেক ব্যাপার কাউকে ইনজেকশন দিয়ে মেরে ফেললে সে নাকি 'শান্তিপূর্ণ মৃত্যু' লাভ করে। এরূপ ধারণাও ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ইসলাম বলে, মৃত্যুকালীন সাকরাতের কষ্ট যার যতটকু হবার হবেই। আমরা দেখতে পারি মৃত্যুর সময় কারো অনেক কষ্ট হচ্ছে কিংবা মুহূর্তে মারা গেছেন- কিন্তু ইতোমধ্যে মৃত্যুপথযাত্রীর উপর ভীষণ আজাব হয়ে যেতে পারে যা আমরা জীবিতরা টেরই পাবার নয়। অপরদিকে দীর্ঘদিন কষ্টে থাকলেও ঠিক মৃত্যু মুহূর্তে হয়তো আজাব লাঘব হয়ে যেতে পারে। সুতরাং এটা ভাবা ঠিক নয় যে, কাউকে হুটকরে গুলিকরে কিংবা অতিরিক্ত ঘুমের ড্রাগ দিয়ে মেরে ফেললেই, সে অবধারিত মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে রেহাই পেয়ে যাবে!

২. ডিজাইনার বেবী প্রসঙ্গঃ পেটে সন্তান ধারণের সময়, ছেলে না মেয়ে হবে তা নির্ধারণ করার অধিকার মা-বাবাকে দেওয়া। এই সুযোগ প্রধানও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। উল্লেখ্য আধুনিক বিজ্ঞান এরূপ সিদ্ধান্তগ্রহণের সুযোগ দিতে সক্ষম- যদিও এখনো কোথাও দেওয়া হয়েছে কি না এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নয়। বিজ্ঞান অনেক আগেই আবিষ্কার করেছে যে, মায়ের পেটে শিশু ছেলে না মেয়ে হবে তা নির্ভর করে একমাত্র পিতার উপর। পিতার বীর্যে দু ধরনের উপাদান বা জিন বিদ্যমান। এর প্রথমটিকে বলে এক্স-ক্রমোজাম আর দ্বিতীয়টিকে বলে ওয়াই-ক্রমোজাম। শিশু পুরুষ হবে যদি তার মধ্যে এই উভয় ক্রমোজাম থাকে। অপরদিকে নারীদের ডিম্বকোষে আছে শুধুমাত্র এক্স-ক্রমোজাম। সুতরাং এটা সহজেই অনুমেয় যে, শিশুর মধ্যে এক্স ও ওয়াই এই উভয় ক্রমোজাম থাকলে সে হবে ছেলেসন্তান। আর শুধুমাত্র এক্স ও এক্স জোড়া থাকলে সে হবে মেয়েসন্তান। তাই, যেহেতু একমাত্র পুরুষের মধ্যে আছে উভয় ক্রমোজাম- মহিলার ডিম্বকোষের একমাত্র এক্স ক্রমোজামের সঙ্গে জোড়া হতে দরকার হবে পুরুষ থেকে একটি ওয়াই না হয় একটি এক্স ক্রমোজাম। আর জোড়া লাগার নামই সন্তানধারণ।

আধুনিক বিজ্ঞান কৃত্রিম উপায়ে মহিলাদের উদরে সন্তানধারণে সহায়তা করে থাকে। পুরুষের বীর্যকে নারীর ডিম্বকোষে ইনজেকশনের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ করা হয়। এসময় বিজ্ঞানী বা ডাক্তার সাধারণ এক্স ও ওয়াই কিংবা যে কোন একটি ক্রমোজাম ব্যবহার করার ক্ষমতা রাখেন। মা-বাবাকে সন্তান চয়েজের ক্ষমতাপ্রদান করলে তারা তা চয়েজ করতে পারবেন। কিন্তু ব্যাপারটি আইনসঙ্গত করে দিলে হয়তো দেখা যাবে অর্ধশতকের ভেতরই পুরো প্রাচ্যব্যাপী ছেলেদের মাত্রা মেয়েদের তুলনায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। আর পশ্চিমা সমাজে তার উল্টোটা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এভাবে পুরো মানবসমাজের মধ্যে কৃত্রিম উপয়ে অসামঞ্জস্যতার সৃষ্টি হবে

যার পরিণতি ভয়ানক হতে পারে। সুতরাং **'ডিজাইনার বেবি'** কৃত্রিম উপায়ে ভয়াল কালরাত্রি সৃষ্টির মতো। এ থেকে মুক্ত থাকা একান্ত জরুরী।

৩. কম-ক্ষতিকর মাদকদ্রব্য ব্যবহার প্রসঙ্গেঃ কম ক্ষমতাসম্পন্ন তরল মাদকদ্রব্য ব্যবহার যেমন ক্যানাবিজ- আইনসঙ্গত করা। এটা নেশাজাতীয় দ্রব্য। কে বা কারা অতীতে না জেনে ধূমপান বৈধ করায় আজ কী হচ্ছে দেখুন। পুরো বিশ্বব্যাপী গণনাতীত মানুষ ধূমপানজণিত ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করছেন। কতো ওয়ার্নিং, কতো শতর্কবাণী! কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। সেদিন এক সিগারেটের প্যাকেটে লেখা দেখলাম, "ধূমপানে আপনি অকালে মৃত্যুবরণ করবেন!"। কিন্তু কাজ হয় নি, মানুষ এই ওয়ার্নিংয়ের দিকে তাকালে অন্ধ হয়ে যায়! কিন্তু ধূমপান অবৈধ করে দিলে কাজ হতো ঠিকই। অনুরূপ আমরা মাদকদ্রব্য ব্যবহারও যদি বৈধ করে দিই- হোক তা অল্প প্রতিক্রিয়াশীল তরল, তাহলে অচিরেই সমাজের এক উল্লেখযোগ্য অংশ বিশেষ করে আমাদের নতুন প্রজন্মের সোনার ছেলেমেয়েরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং এটাও বৈধতাদান হবে স্লিপারি স্লোপের আওতাভুক্ত অপরাধমূলক কর্ম।

৪. কম বয়সহেতু শাস্তি মওকুফ প্রসঙ্গেঃ অল্প বয়সের ছেলেমেয়েরকে অপরাধের জন্য সমুচিত শাস্তিপ্রদান না দেওয়া। এটা খুব কঠোর মনে হতে পারে। তবে সত্য কথা তো ব্যক্ত করতেই হয়। অল্প বয়স হেতু কোন অপরাধের জঘন্যতা মুতাবিক শাস্তি প্রদান না করে মুহাব্বাত দেখানো আদৌ যুক্তিসম্পন্ন নয়। বাস্তবে এটাও হবে স্লিপরি স্লোপের অন্তর্ভূক্ত সিদ্ধান্ত। এই ছেলে বা মেয়ে আরো পরিণত বয়সে বড়ো বড়ো অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে। এটা পুরো সমাজের জন্য হবে মারাত্মক ও অনাকাঙ্ক্ষিত। অবশ্য না-বালিগ বা আন্ডারএজ কিশোর-কিশোরীদের কথা বলছি না। এছাড়া অপরাধের ধরন ও তীব্রতা তো অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে।

ভালো গবেষণা ভুল ফলাফল: উপরে বর্ণিত বিষয়াদি যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে পুরো সমাজে তা হয়তো সবাই মানবেন না- তবে অধিকাংশ মেনে নিয়েছেন। এই চারটি ব্যাপারে এখনও সংলাপ অব্যাহত আছে অধিকাংশ পশ্চিমা সমাজে। স্লিপারি স্লোপের আর্গুমেন্ট এখনও শক্তিশালী আছে। তবে এই 'ভালো গবেষণা' ভুল ক্ষেত্রে লাগানোর চেষ্টাও সময় সময় হয়ে থাকে।

আমেরিকার প্রয়াত প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার [**১৮৯০-১৯৬৯**] সেই **১৯৫৪** সালে ভিয়েতনামে হস্তক্ষেপ বৈধতা প্রমাণ করতে যেয়ে **'ডমিনো এফেক্ট'** থিওরীর জন্ম দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, ভিয়েতনামকে কমিনিউস্ট হতে দিলে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশও কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে- এবং তা গ্রহণ করবে। এটাকেই বলে ডমিনো এফেক্ট। এটা সাধারণ স্লিপারি স্লোপ থিওরীর মতো না হলেও সামঞ্জস্যশীল বা সামর্থবোধক বলা যাবে। কিন্তু এই থিওরী শেষ পর্যন্ত ভুল প্রমাণিত হয়েছে। একমাত্র কম্বডিয়া ছাড়া বাস্তবে কোন ডমিনো এফেক্ট আত্মপ্রকাশ করে নি। ইতোমধ্যে অবশ্য আমেরিকা ভিয়েতনাম যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজয়বরণ করে। সুতরাং যে কোন আর্থ-সামাজিক-রাজীনিতিক সিদ্ধান্তগ্রহণে সতর্কতা অবলম্বন জরুরী। সকল ক্ষেত্রে স্লিপারি স্লোপ, ডমিনো এফেক্ট কিংবা 'চেইন-রিয়েকশন' নিশ্চিত ঘটবে-তা-ও কিন্তু নিশ্চিত নয়। সমাজ-সচেতন ব্যক্তি, গোষ্ঠি ও রাষ্ট্রকে সতর্ক থাকা দরকার। উগ্রপন্থী, সাম্রাজ্যবাদী, বা অন্য কোন অনাকাঙ্ক্ষিত রাজনীতিক শক্তি ক্ষমতাবলে যেনো এসব থিওরী দেখিয়ে জনধ্বংসবিরেধী কোন কার্যকলাপ সহজে আঞ্জাম দিতে না পারে- যেমন আমেরিকা কর্তৃক ভিয়েতনাম দখলের অজুহাতে হত্যাযজ্ঞ-ক্রিয়া সম্পাদন।

একটি ছোট্ট উপমা দিয়ে স্লিপারি স্লোপের বিয়ষটির উপর ইতি টানছি। পশ্চিমা দর্শনে এই বিষয়টি অহরহ আলোচিত হয়। বিষয়টির

শিরোনাম ‘ব্যাঙকে সেদ্ধ করা’ [boiling frog]। বৈপ্লবিক উপায়ে দ্রুত সামাজিক ও রাজনীতিক চরম পরিবর্তন আনয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত অশুভ পরিণতি বুঝাতে এই বিষয়টি বলা হয়ে থাকে। মনে করুন আপনি ইচ্ছা করলেন, [তা যে কোন কারণেই হোক- মূল গল্পে বোধ হয় খাওয়ার জন্য হবে। কারণ পশ্চিমে- আর বিশেষ করে ফ্রান্সের মানুষ ব্যাঙের পা বিশেষ মাজাদার খাদ্য হিসাবে ভক্ষণ করেন।] একটি ব্যাঙকে সেদ্ধ করবেন। আপনি যদি ফুটন্ত পানিতে ব্যাঙটি ফেলেন তাহলে আপনি ব্যর্থ হবেন- সে সাথে সাথে লাফ মেরে বেরিয়ে আসবে! অপরদিকে প্রথমে একে ঠাণ্ডা পানিতে রাখুন, তারপর কম গ্যাসে এই পানি ও ব্যাঙ সেদ্ধ করুন ধীর গতিতে। দেখবেন আপনি কৃতকার্য হয়েছেন। ব্যাঙ লাফ মারবে না।

সমাজবিজ্ঞানীরা উক্ত গল্পের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বলেন, সমাজে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে ‘সময় ব্যয়’ করতে হবে। ধীরে ধীরে লক্ষ্যে পৌঁছা উচিৎ- অন্যথায় ব্যাঙ যেভাবে লাফ মারে ঠিক তদ্রূপ ব্যর্থতার গ্লানি বহন করতে হবে- এমনকি করুণ পরিণতির দিকে ধাবমান হতে পারে সমগ্র সমাজ। অবশ্য আরেকদল তথাকথিত চরম মুক্তমনা গোষ্ঠি উল্টো কথাও বলতে পারেন। এভাবে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আনয়ন হয়তো ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত অনেক মৌলিক সামাজতান্ত্রিক, মানবাধিকার, সেকুলারিজম ইত্যাদি মূল্যবোধ ক্রমান্বয়ে সমাজ থেকে নিঃশেষ হয়ে যাবে! একে তারা ক্রমক্ষয় বা ‘পাওয়ার গ্রাব’ বলে আখ্যা দেন। তাদের মতে হঠাৎ পরিবর্তনের চেষ্টা প্রতিষ্ঠিত সমাজচেতনাকে আরো বেশী দৃঢ় ও পরিবর্তনবিরোধী করতে পারে। সুতরাং যারা সমাজে পরিবর্তন আনয়নের চিন্তা করছেন তা নীরব বিপ্লবের মাধ্যমে আনয়নের চিন্তা করুন- বিপ্লব বিপ্লব বলে নয়!

চিন্তাখাদ্যঃ আপনি কি মনে করেন, যে কোন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ প্রতিরোধে এক-ইঞ্চি পরিমাণ ছাড় দেওয়া ঠিক হবে? স্লিপারি স্লোপ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি? উপরে বর্ণিত বয়েলিং ফ্রগ কেচ্ছাটি আপনাকে কিরূপ প্রতিক্রিয়া দান করেছে- যদি করেই থাকে?

৭. বীর ও কাপুরুষ [hero and coward]: পশ্চিমা কোন কোন দার্শনিক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জেম্‌স মিলার নামক এক সাধারণ সৈনিকের আত্মদানের বীরত্বপূর্ণ গল্প বলেন এই বিষয়টি হাইলাইট করতে। এখানে সেই ঘটনাটি তুলে ধরলাম।

প্রথম মহাযুদ্ধ। জুলাই **১৯১৬** ঈসায়ী। উত্তর ফ্রান্সের 'সমে' নামক এলাকায় যুদ্ধ চলছে। বৃটিশ আর্মির 'কিংস ওউন রয়্যাল লাঙ্কেনশায়ার' রেজিমেন্টের তরুণ ২৬ বছর বয়সের নওজোয়ান প্রাইভেট জেম্‌স মিলার। তুমুল যুদ্ধ চলছে। উভয় পক্ষ ভারী শেলিং ও রাইফেলের গুলাবর্ষণে পুরো রণক্ষেত্র উত্তপ্ত করে তুলেছে। প্রাইভেট জেম্‌স মিলারকে তার সুপেরিয়ার অফিসার নির্দেশ দিলেন, যে কোন মূল্যে একটি ম্যাসেজ অন্য রেজিমেন্টের নিকট পৌঁছাতে হবে। নির্দেশদাতা ও নির্দেশ পালনকর্তা উভয়ে জ্ঞাত এই সংবাদ পৌঁছাতে যেয়ে নিশ্চিত মৃত্যু হবে বার্তাবাহকের। তাই স্বেচ্ছায় এই ঘন ঘন গুলাবর্ষণকে উপেক্ষা করে ছুটে চললো মিলার। সংবাদ নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছালো ঠিক, কিন্তু একাধিক গুলির আঘাতে তার মৃত্যু ঘটলো।

পরবর্তীতে যুদ্ধের সময় বিরাট সাহস দেখানোর জন্য উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মরণোত্তর হিরোইজম মেডেল **'ভিক্টোরিয়া ক্রস'** তাকে প্রদান করা হয়।

চরিত্র দার্শনিকদের নিকট মিলারের এ বীরত্ব বেশ গুরুত্ববহ। মিলার গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর যদি ফিরে আসতো কিংবা নিজেকে বাঁচাতে যেয়ে কোন বাঙ্কারে ঝাঁপিয়ে পড়তো তাহলেও হয়তো তাকে কেউ কাপুরুষ বলতো না। অন্যকথায় মিলার তার 'ডিউটির অতিরিক্ত কাজ করে মৃত্যুবরণ করেছে' [beyond the call of duty]। সুতরাং দার্শনিকরা

বলেন, মিলারের সাহসী পদক্ষেপ ছিলো অসাধারণ। কিন্তু সে যদি গুলিবিদ্ধ হয়ে অন্যভাবে আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতো তাহলে সেটার জন্যও তাকে কাপুরুষ হিসাবে বিবেচনা করা যেতো না। সুতরাং এখানে নৈতিকতাকে দু' ধরনের স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। মৌলিক কিছু কর্ম আছে যা আমাদের করা বা না করা নৈতিক স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে বিবেচিত: যেমন চুরি করবে না, মিথ্যা বলবে না, অন্যের প্রতি সদয় হবে ইত্যাদি মৌলিক মানবিক গুণাবলী। অপরদিকে কিছু কাজ আছে যাকে আমরা অত্যধিক নৈতিক কর্ম বলে আখ্যা দিতে পারি। ইংরেজিত বলে, supererogatory acts। এসব মহৎ কর্ম অত্যন্ত প্রশংসার কিন্তু তা থেকে বিরত থাকলেও নীতিগতভাবে দোষের নয়। তবে আমরা সাধারণত ব্যক্তি হিসাবে সুপারিরোগেটরি কর্মকে বিবেচনা করি। ব্যক্তির সামাজিক, আর্থিক ও পারিবারিক অবস্থানভেদে তার কর্মকে যাচাই করে থাকি। কোন মহৎ বড় নেতার পক্ষে সুপারিরোগেটরি কাজ এড়িয়ে যেতে দেখলে তাঁর প্রতি আমাদের ধারণা অনেকটা প্রশ্নবোধক হয়ে ওঠে। একই সময় ঐ কাজটি আমরা নিজেদের জন্য আঞ্জাম দেওয়া তেমনটি গুরুত্বাপূর্ণ মনে করি না। ব্যাপারটি দর্শনের দিক থেকে চিত্তাকর্ষক। এখানে স্পষ্টতই প্রতীয়মান, এথিকেল স্ট্যান্ডার্ড ক্ষেত্রেবিষেশে ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু মানুষ তো সবই মৌলিকভাবে সমান।

চিন্তাখাদ্য: আপনার সমাজে সুপারিরোগেটরি ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় কি? এই কর্মটি সমাজের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব যেমন, রাজনীতিক নেতা, সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী, সরকারের দায়িত্বশীল লোকজন যেমন মন্ত্রী-মিনিস্টার, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, আলিম-উলামা, পীর-মাশায়েখ প্রমুখের মধ্যে কি সরচাচর দেখা যায়? উত্তর নেতিবাচক হলে, এর কারণ কি বলে আপনি মনে করেন?

৮. ভাগ্য ও পরিণতি [luck and result]: জীবনচলার পথে আমরা এমন কিছু অবস্থার শিকার হই যার পরিণতি সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে আমাদের কর্ম বা ক্রিয়া মূলত পঙ্গু বলা চলে। যা ঘটে, তা হয় অপরের কোন ক্রিয়ার ফলাফল না হয় দৈবচক্র। তবে ফলাফল যেটাই হোক, ঘটনার সঙ্গে জড়িতজনকে সময় সময় আইনের দণ্ডে দণ্ডিত হতে হয়। অপরদিকে অনুরূপ আরেক ঘটনা বা দোষের জন্য অপরকে হয়তো ছাড় দেওয়া হয়। এসব অনাকাঙ্ক্ষিত 'ভাগ্যের পরিণতি' কী হতে পারে তার একটি [পাশ্চাত্যের] সচরাচর দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

বৃটিশ-আমেরিকার আইনে যে কোন [প্রাইভেট ও পাবলিক যোগাযোগের সঙ্গে জড়িত] ড্রাইভার নিদিষ্ট পরিমাণ মদ পান করেও ড্রাইভ করতে পারেন। এটাকে বলে 'এ্যালকাহল লিমিট'। জন ও ক্লাইভ দুই বন্ধু। মদের বারে বসে কিছু মদপান করলেন। তারা এ্যালকাহল লিমিটের সামান্য বেশী পান করে ফেলেছেন। এরপরও ড্রাইভিংয়ে তেমন অসুবিধা হবার নয়। এভাবে সামান্য সীমাতিক্রম করে অতীতে অনেকবার তারা ড্রাইভ করেছেন, কোন সমস্যা হয় নি। কিন্তু এ রাত উভয়ে যারতার গাড়িতে আরোহণ করলেন। ড্রাইভ করে বাড়ি যাওয়ার পথে ক্লাইভ ঠিকই নিরাপধে স্বগৃহে পৌঁছে যান। জন তেমন ভাগ্যবান ছিলেন না। বড় রাস্তায় ওঠার পর কিছুক্ষণের মধ্যে কোত্থেকে এক নওজোয়ান দ্রুত তার গাড়ির সামনে এসে পড়লো। খুব সজোরে ব্রেক কষলেন জন। ফায়দা হলো না। দুর্ঘটনা এড়াতে পারলেন না- তরুণ ছেলেটি সাথে সাথে মারা গেল। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে বুঝতে পারলো জন মদ পান করেছেন। ব্রেথেলাইজার নামক যন্ত্রের মাধ্যমে একাধিকবার টেস্ট করে নিশ্চিত হলো পুলিশ জনের রক্তে এ্যালকাহলের মাত্রা লিমিটের বেশী। সুতরাং তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হলো পুলিশ স্টেশনে।

আর বলার দরকার নেই। জনকে যে জীবনের এক উল্লেখযোগ্য অংশ জেলে কাটাতে হবে তা প্রায় নিশ্চিত। অপরদিকে সৌভাগ্যবান বন্ধু ক্লাইভ অনুরূপ পরিমাণ মদ পান করেও বেঁচে গেলেন- ড্রাইভিংয়ের সময় কোন দুর্ভগ্য তার উপর পতিত হয় নি। জন যে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন, তা ছিলো তার নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। অপরদিকে তিনি নিজে এ্যালকাহল লিমিট ছাড়িয়ে মদপান করেছিলেন। সেদিন যদি এই লিমিটের ভেতর থাকতেন বা মদপান করতেন না- তাহলে আইন তাকে এমন কঠোর শাস্তি দিত না। মোটকথা দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছের জন যার পরিণতিতে কঠোর শাস্তিরও সম্মুখীন হয়েছেন তিনি।

এই ঘটনা থেকে অনুমেয়, কর্তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা সত্ত্বেও একটি দুর্ঘটনার জন্য কর্তা দায়ী হলেন। চরিত্র দর্শনে অনুরূপ ব্যাপারকে বলে ‘moral luck or moral bad luck’। আমরা অনেক সময় কিছু কার্য করি যা সঠিক কি না তা নির্ভর করে ফলাফলের উপর, যদিও কাজটি মূলত বে-খিয়ালবশত হয়ে থাকে। আরো একটি সিনারিও তুলে ধরলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

বাথটাবে বাচ্চা রেখে পানি ছেড়েছেন মা পান্না। নীচের তলায় ছুটে আসলেন অন্য শিশুর কান্না শোনে। মনে এটা, পানি যথেষ্ট হতে কিছু সময় লাগবে। কিন্তু নীচে এসে অন্য ঝামেলা! এক ব্যক্তি ফোন করলেন। বেশ জরুরী খবর। পান্নার বাবা গুরুতর অসুস্থ। তিনি বসে পড়লেন সেটিতে। ভুলে গেলেন ক্ষণকালের জন্য বাথটাবে পড়ে থাকা বেবির কথা। এরপর ছুটোছুটি। দৌড়ে উঠলেন সিড়ি বেয়ে উপর তলায়। বাথরুমের ভেতর ঢুকে হাইমাউ করে কাঁদতে থাকেন পান্না। বেশী দেরী হয়ে গেছে! তার আদুরের সন্তান আর নেই!

সন্তান হত্যার করুণ গ্লানি নিয়ে সারা জীবন কাটাতে হবে পান্নাকে। অথচ, ব্যাপারটি তো এরকম ছিলো না। নিজের এই মা'ছুম সন্তানকে হত্যা করার প্রশ্নই তো ওঠতে পারে না। কিন্তু আইন তো আইনই। সামান্যতম মোটিভ পেলেই তো ফেঁসে যায় সবকিছু। পুলিশ জোর তদন্ত চালিয়ে যখন হত্যার কোন মোটিভ পেলো না তখন আইনও তার বর্ণিত ঘটনার বিবরণ গ্রহণ করলো- পান্নাকে মুক্তি দিল। কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থলে যে বেদনা- যে গিল্ট বিরাজমান তা কখনো মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত লাঘব হবে না পান্নার। অনাকাঙ্ক্ষিত, দুর্ভাগ্যের কবলে পড়ে তিনি এখন বন্দীনী নিজের মধ্যে- নিজের অভ্যন্তরে কঠিন, করুণ গভীর বেদনা নিয়ে, যা কেউ কখনো দেখবে না।

আপনি ইচ্ছে করে আমার উপর গরম চা ফেলে দিলে তা হবে অন্যায়। রাগে-গোস্বায় আপনাকে মারতে উদ্যত হতেও পারি। কিন্তু ট্রেনের ঝাঁকুনি হেতু আপনার হাতের চা আমার উপর পড়ে গেল! এতে কি আমি রাগ করবো? মোট কথা, কারো নীতি-নৈতিকতার মাপকাঠি অনেক ক্ষেত্রে কর্তার কাজের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং এ থেকে যে ফলাফল আসে কিংবা কর্মের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নিজস্ব দৃষ্টিকোণও বিচারের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে। আপনি চা ফেলে আমার সাধের নতুন জামাটিতে দাগ ফেললেন যা সঠিক না অঠিক, নৈতিক বা নীতিবিরুদ্ধ তা নির্ভর করে আমার পারসেপশন বা দৃষ্টিকোণের উপর। আমি যদি মনে করি এটা ছিলো আপনার উদ্দেশ্য, তাহলে আপনি নীতিবান নন। আর অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা হিসেবে আমি ধরে নিলে অবশ্যই আপনাকে দোষি মনে করবো না- যদিও এ ক্ষেত্রে দোষ চাপানোর চেষ্টা আমি নিজে নীতিবান নয় বলে প্রমাণিত হতে পারে- অন্তত আপনার নিকট।

আরো অনেক ঘটনা সচরাচর ঘটছে যার নীতি-নৈতিকতা যাচাই-বাছাই সত্যিই কঠিন। যেমন, ক্রিকেট খেলার সময় অল-রাউন্ডারের শক্ত

বাড়িতে একটি ছক্কা আসলো বাংলাদেশ দলের। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত শক্ত বলটি একটি শিশুর মাথায় পড়ে গেল। ফেটে গেল তার নরম মাথার খুলি। এখন এই দুর্ঘটনার জন্য তো ক্রিকেটারকে দায়ি করা যাবে না। অপরদিকে বেচারা শিশুটি হয়তো দীর্ঘদিন হাসপাতালে থেকে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়বে। আপনি ম্যাজিস্ট্রেট বা জজ। কিভাবে ব্যাপারটি নৈতিক দিক থেকে বিচার করবেন? কাকে আপনি এই ঘটনার জন্য দায়ী করবেন- যদি পারেনই? আপনি কি ক্রিকেট খেলা অবৈধ মনে করেন? না, তা হয়তো করবেন না। কারণ এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটে না। খুবই বিরল। সুতরাং শেষমেষ বিষয়টি ভাগ্যের উপরই ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু খেলাধূলা থেকে মানুষ মৃত্যুর শিকার হয়েছেন। আক্রান্ত হয়েছেন আলজাইমার সিন্ড্রম নামক মারাত্মক রোগের। বিশ্ববিখ্যাত হেভিওয়েট বক্সার মুহাম্মদ আলী এই রোগে আক্রান্ত। সুতরাং বক্সিং খেলা কি নীতি-নৈতিকতা বিরুদ্ধ নয়? আমরা যদি মুহাম্মদ আলী এবং আরো বেশ কয়েকজন রোগীকে তাদের খেলার সঙ্গে নিশ্চিতভাবে সম্পৃক্ত করি তাহলে ওসব খেলা হতে দেওয়া কি আমাদের জন্য নীতি-নৈতিকতা বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত হবে না?

সুতরাং 'মোরাল লাক' বা 'নৈতিক সৌভাগ্য' এবং 'মোরাল আনলাকি' বা 'নৈতিক দুর্ভাগ্য' বলতে কিছু আছে কি না তা নিয়ে পশ্চিমা দর্শনে সংলাপ অব্যাহত আছে। এখনো কেউ সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেন নি।

উপসংহারে কয়েকটি প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হচ্ছে: ১. যাকিছুই আমরা করি না কেন, আমরা কি তা সবসময় মুক্তমনে করি? ২. যদি কাজের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতা না থাকে, তাহলে এটার ফলাফল যাই হোক, তার জন্য কি আমরা দায়ী? ৩. দায়িত্বহীনতা হেতু কাউকে দোষী সাব্যস্ত ও শাস্তিপ্রদান কতটুকু নীতিসম্মত হতে পারে?

উপরের প্রশ্নগুলো এ বিষয়ের মূল। কিন্তু এগুলোর সুস্পষ্ট কোন জবাব নেই- যদিও কেইস বাই কেইস জবাব মিলতে পারে। কিন্তু সার্বজনীন কোন জবাব নীতি-নৈতিকতা বা এথিক্স নিয়ে গবেষণা করে দার্শনিকরা খুঁজে পান নি আজো। অবশ্য থিওরীর অভাব নেই। কোন কোন দার্শনিক মনে করেন, 'মোরাল লাক' বলতে কিছু নেই! এরপর উপরে উপস্থাপিত বিভিন্ন সিটুয়েশন নিয়ে গবেষণা করে ভিন্নভাবে বুঝাতে চেষ্টা করেন। অন্যরা মোরাল লাক এর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না বটে। কিন্তু এরপর নৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ কিভাবে নিতে পারি তার ব্যাখ্যা বিভিন্নভাবে তুলে ধরেন। কোন্ সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছি তা অবশ্য গুরুত্বহ কিন্তু এখনো চিন্তাশীলদের মধ্যে কোনো মতৈক্য সৃষ্টি হয় নি। অদূর ভবিষ্যতে হওয়ারও কোন আভাস মিলছে না।

চিন্তাখাদ্যঃ আমরা প্রবাদ বাক্য শুনে থাকি, 'ফরচুন ফেভার দ্যা ব্রেব' [fortune favour the brave] - সাহসীর সঙ্গে থাকে সৌভাগ্য। অনুরূপ 'ফরচুন ফেভার দ্যা গুড' [fortune favour the good] - উত্তমের সাথী সৌভাগ্য, এ কথাটিও কি সত্য বলে আপনি মনে করেন? কর্মের কারণ, না ফলাফল আমাদের বিবেচানায় প্রাধান্য পাওয়া উচিৎ?

৯. গুণ চরিত্রদর্শন [virtue ethics]: ৪০০ বছর যাবৎ নীতি-নৈতিকতা নিয়ে চিন্তাশীল দার্শনিকরা গবেষণার ফোকাস কর্মের প্রতি নিবদ্ধ রেখেছেন। কর্তার প্রতি নয়। তাদের চিন্তা আমরা 'কিসব করি'- সেটা নিয়ে, 'কোন্ ধরনের মানুষ হওয়া উচিৎ'- সেটা নিয়ে নয়। তাদের কাজ ছিলো একসেট নীতি বা নৈতিক ফর্মুলা যাকে মানবিক গুণাবলী বা ভার্চু বলা যায়, তৈরী করা- যেগুলো সকলে অনুসরণ করতে পারেন।

আধুনিক যুগে একদল দার্শনিক ভিন্নভাবে চিন্তা করছেন। তারা ওসব আইন-কানুন নিয়ে পুনরায় মাইক্রস্কোপের নীচে এনে গবেষণা চালাচ্ছেন। ৩০০ বছরের পুরাতন কর্তব্যনির্ভর 'ক্যাটাগরিকেল ইম্পারেটিভ'- কান্টিয়ান এথিক্স, বেনথাম [১৭৪৮-১৮৩১] এবং মিল্ [১৭৭৩-১৮৩৬] কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ফলাফলনির্ভর 'কন্সসেকুয়েন্টিলিস্ট ইউটিলিটেরিয়ানিজম' [উপরে দেখুন] এথিক্স তারা তলিয়ে দেখছেন। তৈরী করার চেষ্টা করছেন ভিন্ন ধরনের ফর্মুলা। এরপরও বলতে হবে, ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ শতকে যথাক্রমে বিজ্ঞানী গ্যালিলিও [১৫৬৪-১৬৪২] এবং নিউটনের [১৬৪২-১৭২৭] আভির্বাবের পর থেকে দার্শনিকরা কর্তা থেকে কর্মের গুরুত্ব অধিক দিয়ে আসছেন। তাদের কথা, গুণাবলী মূখ্য- গুণাবলীসম্পন্ন ব্যক্তি নন। এথিক্সে কর্ম বা গুণ প্রাইমারী এবং কর্তা বা কার্য সম্পাদনকারী সেকেন্ডারী বা ক্রিয়ার মাধ্যম মাত্র। কিন্তু এ চিন্তার পরিবর্তন ঘটছে আধুনিক যুগে।

কেউ কেউ গ্যালিলিও-নিউটন-পূর্ব যুগের চরিত্র দর্শনের দিকে ফিরে যাচ্ছেন যা ছিলো মূলত [এটা অবশ্য পশ্চিমা ইতিহাসবিদদের মত। মুসলিম দর্শন যে ইতোমধ্যে আত্মপ্রকাশ করে বিরাট উৎকর্ষ সাধন করেছিল, তা অনেকে এখনো ব্যক্ত করতে কেনো যেনো 'লজ্জাবোধ' করেন! বিশেষ করে ইমাম গাজ্জালীর হাতে চরিত্রদর্শন যে বিরাট প্রভাবশীল উৎকর্ষ লাভ করে তা পরবর্তী যুগের খ্রিস্টবাদী দার্শনিক সেন্ট থমাম একুইনাক্স [১২২৫-১২৭৪] পর্যন্ত বিনা দ্বিধায় শিকার করেছেন।

ঐশীভিত্তিক চরিত্রদর্শন ইমাম গাজ্জালীর আবির্ভাব ছাড়া হয়তো তখনই হারিয়ে যেতো। আর থমাস একুইনাস যাকে খ্রিস্টবাদ রক্ষক হিসাবে অনেকে আখ্যা দিয়েছেন, ইমাম গাজ্জালীর নিকট চিরঋণী হয়ে আছেন। ইমাম গজ্জালী থেকে যে প্রভাবিত হয়েছিলেন তা তিনি নিজেই বলেছেন।] প্লোটে [খ্রি.পূ. ৪২৮-৩৪৭] ও খাস করে তার শিষ্য এ্যারিস্টটলের [খ্রি.পূ. ৩৮৪-৩২২] এথিক্স। উভয়ের মূল চিন্তা ছিলো, ভালো চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচন এবং এর আবাদ বা ব্যবহার। তাদের নিকট এ প্রশ্নটি মৌলিক ছিলো না যে, **"[এরূপ কিংবা ওরূপ অবস্থায়] কোন্ কাজটি সম্পাদন সঠিক হবে?"** বরং আসল প্রশ্ন ছিলো, **"সর্বাপেক্ষা উত্তম জীবনপদ্ধতি কোনটি?"**। তাদের নিকট মূল্যবোধ বা নৈতিক উৎকর্ষ ছিলো গবেষণার মূল। আধুনিক যুগে নতুন আঙ্গিকে এ্যারিস্টটলের চরিত্র দর্শন পুনরায় চালু করেছেন কিছু পশ্চিমা দার্শনিক। এই মুভমেন্টের নাম 'virtue ethics' [মূল্যবোধ চরিত্রদর্শন]।

এথিক্স ও মরালিটি কি একই জিনিস? এ্যারিস্টটলের দর্শনে এই উভয়টির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। আধুনিক যুগে দার্শনিকরা উভয়টির পুনঃসংজ্ঞাদানে আগ্রহ প্রকাশ করছেন। কেউ কেউ প্রস্তাব দিয়েছেন 'মরালিটি' [morality] শব্দটি দ্বারা ইমানুয়েল কান্ট [১৭২৪-১৮০৪] ও অন্যান্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কর্তব্যের প্রিন্সিপাল এবং কার্যবিধির উপর সীমাবদ্ধ রাখা। অপরদিকে গ্রীক শব্দ 'ক্যারাক্টার' [character] থেকে উদ্বুদ্ধ 'এথিক্স' [ethics] দ্বারা বুঝানো উচিৎ দার্শনিক এ্যারিস্টটলের দর্শনভিত্তিক চরিত্রদর্শনকে। তবে সবাই এ প্রস্তাবে রাজী হন নি। অনেকের মতে এরূপ সীমাবদ্ধতা দর্শনিক এই উভয় দিকের মধ্যে সংঘর্ষ-সংঘাত বাড়বে।

ভারচুর উপর গ্রীকদের গবেষণা: এ্যারিস্টটল ও অন্যান্য গ্রীক চিন্তাবিদরা মনে করতেন, ভালো লোক হওয়া এবং ভালো-মন্দের মধ্যে সঠিকভাবে পার্থক্যনির্ণয় মৌলিকভাবে শুধু বুঝার ব্যাপার নয়। আর এসব

বুঝে কিছু নৈতিক আইন-কানুন ও প্রিন্সিপাল এপ্লাই করাও যথেষ্ট নয়। আসলে, এটা হলো ব্যক্তিত্বসৃষ্টির ব্যাপার। সঠিক জ্ঞানার্জন ও উত্তম অভিজ্ঞতা দ্বারা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গড়ে তোলা। এতে মানবিক গুণাবলীর বিকাশ স্বভাবে পরিণত হবে। এমনিতেই অবস্থা ও স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সঠিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ব্যক্তির মধ্য থেকে বেরিয়ে আসবে। মোটকথা, ব্যক্তির মধ্যে বিরাজ করবে সঠিক ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যা হবে স্বাভাবিক ও জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্ত। সব ধরনের ইস্যুতে সঠিক ধরনের চারিত্রিক কার্যাদি এমনিতেই ফুটে ওঠবে। এগুলোই এ্যারিস্টলট প্রমুখ প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের নিকট ভারচু বা মূল্যবোধ। তাদের মধ্যে এরূপ ভারচুর মানেই হলো '*eudaimonia*'। এটি একটি গ্রীক শব্দ যার অর্থ ইংরেজি 'hapiness' শব্দটির অর্থের কাছাকাছি। গ্রীক চিন্তাবিদরা মনে করতেন এটাই হলো মানবিক সর্বোত্তম গুণ এবং মানবতার জন্য সার্বিক কল্যাণকর চরিত্র। ইউডাইমোনিয়া শব্দটির অর্থ 'আনন্দ' থেকেও আরো ব্যাপক বলে অনেকে মনে করেন। তারা বলেন, এর অর্থ হওয়া উচিৎ 'এক সফল [ভাগ্যশীল] জীবনানন্দ'। গ্রীকরা চারটি মৌলিক ভারচু বা মূল্যবোধের কথা বলেছেন: **সৎসাহস, সুবিচার, মিথাচার এবং প্রজ্ঞা**। তবে এ্যারিস্টটল ও প্লেটোর দর্শনে কেন্দ্রীয় একটি বিষয় আছে যাকে তারা 'মূল্যবোধের এককত্ব' [unity of virtue] বলেছেন।

গ্রীকরা মনে করেন, ভারচুর সবদিক সঠিকভাবে জেনে অবস্থাভেদে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হবে। এ্যারিস্টটল বলেন, সকল ভারচু ব্যক্তির মধ্যে থাকা ও তা সঠিকভাবে আবাদ বা চাষ করা ভালো মানুষের চরিত্র-পরিচায়ক। তিনিই হলেন 'magnanimity' [লাতিন শব্দ যার অর্থ মহাত্মা] এর অধিকারী। এ্যারিস্টটলের 'megalopsychos' [অর্থ, মহাত্মার অধিকারী মানব] হলেন উত্তমতা ও ভারচুর আদর্শ।

স্বর্ণালী মধ্যমপন্থা [the golden mean]: চরিত্র দর্শনের উপর আমাদের এই দীর্ঘ আলোচনার ইতি টানবো একটু পরই। এর আগে

এ্যারিস্টটলের চরিত্রদর্শনের কেন্দ্রীয় বিষয় নামে খ্যাত 'গোল্ডেন মিন' এর উপর কিছু ব্যাখ্যা তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি। প্রথমে মহান এই দার্শনিকের একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি [ইংরেজিতে]। তিনি লিখেছেন, "Virtue, then is a state of character concerned with choice, lying in the mean which is defined by reference to reason. It is a mean between two vices, one of excess and one of deficiency; and again, it is a mean because the vices respectively fall short or exceed what is right in both passions and actions, while virtue both finds and chooses that which is intermediate - Aristotle, c.350 BC"।

উপরের উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট, মধ্যমপন্থার সংজ্ঞা আসতে হবে যুক্তির মাধ্যমে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যেতে পারে কাপুরুষতা এবং [যে কোন বীরত্বপূর্ণ কার্যে] অতি-তাড়াহুড়া এর মধ্যম ভারচু হলো সাহসিকতা। সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্রে দুশমনদের সামন থেকে পালিয়ে যাওয়া কাপুরুষতা হলেও, বোকার মতো সঠিক পরিকল্পনা ছাড়া দুশমনদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নামও কিন্তু বীরত্ব নয়। যুক্তিপূর্ণ সাসহই মৌলিক। মোটকথা, সকল ক্রিয়ার মূলে থাকতে হবে যুক্তি, নৈতিকতা, স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা এবং সৎসাহস। এ্যারিস্টটলের **'গোল্ডেন মিন'** এর অর্থ এটাই।

চিন্তাখাদ্যঃ প্রশ্ন হচ্ছে আপনি কে- আপনি কি করেন তা নয়। গ্রীক চরিত্রদর্শনের এই মৌলিক ধারণার প্রতি আপনি কতটুকু একমত? পশ্চিমে একটা কথা আছে, আপনি কি বলেন আসে যায় না- কিভাবে বলেন সেটাই মূখ্য। এ কথাটি গ্রীক চরিত্রদর্শনের সাথে সাংঘর্ষিক মনে হয়- আপনি কি মনে করেন?

৪. দর্শনশাস্ত্রে যুক্তিবিদ্যা [logic]: অর্থ ও ব্যাখ্যা

৪.ক. তর্কের বিভিন্ন ধরন: দর্শনশাস্ত্রে লকিজের গুরুত্ব অপরিসীম। বেট্রান্ড রাসেলের [১৮৭২-১৯৭০] মতে, 'লজিক হলো দর্শনের মূল [এসেন্স] ...”। আপনি যদি কোন দার্শনিক থিওরী প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত থাকেন [এ কাজটিতে লেগে যেতে অবশ্যই সকলকে উপদেশ আমি দেবো না!] তাহলে প্রথমেই যে বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে তার নাম তর্কবিতর্ক [arguments]। দার্শনিকরা বলেন, দর্শনের থিওরীটিক্যাল দেওয়াল সৃষ্টি করতে হয় একাধিক ইট দ্বারা। আর প্রতিটি ইট হলো এককেটি আর্গুমেন্ট। কিন্তু ইট এখানে সেখানে বিচ্ছিন্নভাবে পড়ে থাকবে যদি না সবগুলোকে একত্রে জড়িত করা না হয়। আর এই একত্রকরণের মাল-মসলাই লজিক। ভালো ধারণা মূল্যহীন যদি না এগুলো ভালো আর্গুমেন্ট দ্বারা সমর্থনযোগ্য হয়। আর এসব আর্গুমেন্ট যুক্তিতর্কের মানদণ্ডে যাচাই করা চাই। আর এটা সঠিকভাবে আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব একমাত্র লজিক দ্বারা। তবে, লজিক দ্বারা সমর্থিত পরিষ্কারভাবে উপস্থাপিত যুক্তিতর্কও কিন্তু একশত পার্সেন্ট মহাসত্য- তা কিন্তু নয়। ঠিক বিজ্ঞানের থিওরীর মতো দর্শনের থিওরী ও যুক্তি কিন্তু সর্বদাই সমালোচার জন্য উন্মুক্ত থাকে। কখনো সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। আপনার উপস্থাপিত থিওরী খোলা থাকবে প্রতিক্রিয়া, মৃদু থেকে কঠোর সমালোচা ও পুনর্বিবেচনার জন্য সর্বদাই। এমনকি আপনার এই থিওরীটি পুরো দর্শনজগতে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্যও হতে পারে। এভাবেই যুগ যুগ ধরে দর্শনের প্রগ্রেস হয়ে আসছে। চূড়ান্ত দর্শন বলতে কিছুই নেই।

আর্গুমেন্ট বা তর্ক-বিতর্ক শুরু হয় সাধারণ যুক্তিনির্ভর গ্রহণযোগ্য মৌল বিষয় [premises] বা প্রতিজ্ঞা থেকে। কিন্তু একে সামনে এগিয়ে নিতে প্রয়োজন হয় প্রমাণের। এই প্রমাণে পৌঁছাকেই বলে কনক্লুশন [conclusion] বা উপসংহার। প্রেমিজেজ হলো মৌলিক উপস্থাপন যা

গ্রহণযোগ্য হতে হবে- অন্তত এ বিশ্বাস রাখতে হবে। এটা গ্রহণযোগ্য হলেই আর্গুমেন্টের সূত্রপাত ঘটতে পারে। প্রেমিজ সৃষ্টির বিভিন্ন উপায়-অবলম্বন আছে। তা হতে পারে লজিক থেকে সৃষ্ট বা প্রমাণসাপেক্ষ- অর্থাৎ এম্পিরিক্যাল [empirical]। এছাড়া প্রেমিজ পূর্বেকার আর্গুমেন্টের কনক্লুশনও হতে পারে। প্রেমিজ থেকে কনক্লুশনে আরোহণকে বলে ইনফেরেন্স [inference] - মানে সর্বশেষ পর্যায়ে গমন। এই প্রেমিজ থেকে কনক্লুশনে আরোহণের সঙ্গে জড়িত যুক্তিতর্ক কতটুকু শক্তিশালী তা-ই নির্ধারণ করে আর্গুমেন্টের দৃঢ়তা ও গ্রহণযোগ্যতা। ভালো ইনফেরেন্সকে খারাপটি থেকে পৃথককরণের কাজে যে জিনিসটি কেন্দ্রীয় গুরুত্ব বহন করে তার নামই লজিক।

লজিকের কার্যকারিতা: আর্গুমেন্ট গবেষণার নাম লজিক। এ থেকেই শক্তিশালী প্রিন্সিপাল কিংবা ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এই ফাউন্ডেশন থেকে শেষ পর্যন্ত সঠিক ইনফেরেন্স সৃষ্টি হতে পারে। আর্গুমেন্টের কোনো বিশেষ তথ্যাদির সঙ্গে লজিকের তেমন সম্পর্ক নেই- শুধুমাত্র এর সার্বিক কাঠামো এবং ধরণ মূখ্য। সুতরাং, আমাদেরকে যদি একটি আর্গুমেন্ট দেওয়া হয়, 'সকল পাখির পালক আছে; দোয়েল একটি পাখি; অতএব দোয়েল পালকবিশিষ্ট', লজিশিয়ান হিসাবে আমরা বলবো, 'সকল K হলো e; U একটি K; সুতরাং U হলো e'। লক্ষ্য করুন এখানে বিশেষ বাক্যগুলোর বদলে ইংরেজি অক্ষর দ্বারা চিহ্ন দিয়েছি। এখন পুরো ইনফেরেন্সের শক্তি বিষয় ছাড়াও স্বাধীনভাবে নির্ধারণ করা যাবে। প্রাথমিক যুগে লজিকের গবেষণা অনুরূপ সাধারণ ইনফেরেন্সের দ্বারা করা হতো। আর এ ধরনের ইনফেরেন্সকে 'সিলোজিজম' [syllogism] বলে। আধুনিক যুগে - অর্থাৎ গত শত বছর যাবৎ লজিকের ব্যাপ্তি প্রশস্ত হয়েছে। এখন এটা একটি শক্তিশালী গাণিতিক গবেষণার হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

ডিডাক্টিভ আর্গুমেন্ট [deductive argument]: উপরে দেওয়া পাখির পালক আর্গুমেন্টকে বলে ডিডাক্টিভ আর্গুমেন্ট। অর্থাৎ আমরা পাখির পালক থাকার ব্যাপারটি 'মনে করেছি, সচক্ষে পর্যবেক্ষিত সত্য থেকে'। এখানে আমরা কংক্লুশনে পৌঁছেছি প্রেমিজ থেকে, এবং আর্গুমেন্ট গ্রহণযোগ্য বা ভেলিড বলে সাব্যস্ত করা হয়। একটি গ্রহণযোগ্য [ভেলিড] আর্গুমেন্টের প্রেমিজসমূহ সত্য হলে, কংক্লুশন সত্য হওয়া নিশ্চিত। এ ক্ষেত্রে আর্গুমেন্টকে 'সাউন্ড' [সঠিক] হিসাবে মেনে নেওয়া হয়। ডিডাক্টিভ আর্গুমেন্টের কংক্লুশন প্রেমিজের দিক থেকে ইমপ্লিসিট [implicit] বা বুঝসম্পন্ন। অন্য কথায় কংক্লুশন 'তার প্রেমিজের বাইর' পর্যন্ত ব্যাপ্ত নয়। তবে যে কোন প্রেমিজকে গ্রহণ করে এ থেকে লজিক দ্বারা প্রাপ্ত কংক্লুশনকে অগ্রাহ্য করতে পারবেন না- এটা হবে স্ববিরোধিতা।

ইন্ডাক্টিভ আর্গুমেন্ট [inductive argument]: জগতে মৌলিকভাবে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কে আমরা অবগত। এই সচরাচর পর্যবেক্ষিত সত্য থেকে যে ধারণা বা বিশ্বাস আমাদের মনে দানা বাঁধে তাকেই বলে ইন্ডাকশনজণিত জ্ঞান। যেমন, আমরা জানি সবকিছু আকাশে স্থির অবস্থা থেকে মাটিতে পতিত হয় যদি না অন্য কোন শক্তি বস্তুটির উপর ক্রিয়া করে। একে বলে মহাকর্ষ। এই জ্ঞানটি মূলত ইন্ডাকশন থেকে প্রাপ্ত। অনুরূপ লজিকেও আর্গুমেন্ট হতে পারে ইন্ডাক্টিভ, এবং এ থেকে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সাধারণ আইন বা প্রিন্সিপাল। কিন্তু এটা উপরে ব্যাখ্যাত ডিডাক্টিভ আর্গুমেন্ট থেকে দুর্বল।

ইন্ডাক্টিভ আর্গুমেন্টের দৃষ্টান্তঃ একাধিক পর্যবেক্ষণ থেকে এটা নিশ্চিত জানা গেল, স্তন্যপায়ী প্রাণী জন্ম দেয় জীবিত [বা মৃত] বাচ্চা। সুতরাং ইন্ডাক্টিভ উপায়ে এটা বলা চলে, সকল মামাল বা স্তন্যপায়ী প্রাণী অনুরূপভাবে বাচ্চা জন্ম দেয়। কিন্তু এরূপ আর্গুমেন্ট কখনো [ডিডাক্টিভ আর্গুমেন্টের মতো] গ্রহণযোগ্য হতে পারে না; কারণ এর কংক্লুশন তার

প্রেমিজ থেকে হবে তা নিশ্চিত নয়। অন্য কথায়, এটা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু কংক্লুশন মিথ্যা। আর এ ক্ষেত্রে কংক্লুশন ভুল হওয়ার প্রমাণও পাওয়া যায়। পরবর্তীতে জানা গেছে 'প্লাটিপাস' [platypus] ও অন্যান্য কিছু স্তন্যপায়ী প্রাণী আছে, যারা ডিম পাড়ে।

সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে ইন্ডাক্টিভ যুক্তিতর্ক সর্বদাই তার প্রেমিজ থেকে সামনে চলে আসে। তাই কংক্লুশন কখনো এর দ্বারা পুরোদমে প্রমাণিত হয় না- বরং তা সমর্থনযোগ্য করে মাত্র। ফলে কংক্লুশন ভুল বা সত্য হতে পারে- যদিও সত্য হওয়ার দিকে পাল্লা ভারী থাকে। ইন্ডাক্টিভ আর্গুমেন্ট বিভিন্ন ধরনকে সাধারণকরণের প্রক্রিয়াঃ বিশেষ থেকে সাধারণ; দৃশ্যমান থেকে অদৃশ্য; অতীত এবং বর্তমান ঘটনাবলী বা দৃষ্টিকোণ থেকে ভবিষ্যতগুলোর।

ইন্ডাক্টিভ যুক্তি এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে মনে হয় খুব একটা শক্তিশালী প্লাটফর্ম নয়- কিন্তু পশ্চিমা দর্শনে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এর কারণ হিসাবে বলা হয়, অতীত এবং বর্তমানের ঘটনাবলীর দৃশ্যতঃ স্বরূপ থেকেই আমরা সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা করতে সক্ষম হই। ইন্ডাকশন থেকেই আইন ও বিজ্ঞানসম্মত সুচিন্তিত ধারণার জন্ম নেয়। এসব কথা কিন্তু দার্শনিকরা বিনা প্রশ্নে মানতে রাজী নন। বিশেষকরে এই প্রশ্নটির কথা ভাবুনঃ **'উপরোক্ত [স্তন্যপায়ী প্রাণী সম্পর্কিত] ধারণার উপর বিশ্বাস রাখা কি সঠিক হবে?'**।

স্কটিশ দার্শনিক ডেভিড হিউম [১৭১১-১৭৭৬] উপরোক্ত প্রশ্নের জবাব নেতিবাচকভাকে দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন, ইন্ডাক্টিভ যুক্তিতর্কের উপর বিশ্বাস রাখা আসলে যুক্তিহীন! তিনি তর্ক করেন, ইন্ডাক্টিভ আর্গুমেন্ট এটাই বিশ্বাস রাখে যে **'প্রকৃতিতে সামঞ্জস্যতা বিদ্যমান'**। এর ফলে এটা মনে করা হয়, ভবিষ্যৎ অতীতের মতো

সামঞ্জস্যশীল হবে যখন কোন অনুরূপ অবস্থার সূত্রপাত ঘটবে। কিন্তু এরূপ হওয়ার নিশ্চয়তা স্বাধীনভাবে প্রদানের কোন উপায় আছে কি, একমাত্র ঐ ইন্ডাক্টিভ যুক্তি ছাড়া? এছাড়া শুধুমাত্র ইন্ডাক্টিভ যুক্তিতর্কই যদি প্রকৃতি সামঞ্জস্যশীল [uniform] হওয়ার প্রমাণ উপস্থাপন করে তাহলে - গোলকধাঁধাঁয় পতিত হওয়া ছাড়া স্বয়ং ইন্ডাক্টিভ যুক্তিতর্ক গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অন্যকথায়, থিওরী নিজেই তাকে প্রমাণ করতে পারে না!

অনেকে হিউমের আক্রমণকে প্রতিহত করতে ও ডিফেন্স হিসেবে ইন্ডাক্টিভ থিওরীর অতীত সফলতা উপস্থাপন করে থাকেন। তারা বলেন, মূলত এটা কার্যকরী। কিন্তু এটা ভবিষ্যতে কার্যকরী হওয়ার নিশ্চয়তা নেই- কারণ, একমাত্র ইন্ডাক্টিভ যুক্তিতর্ক [যা মূলত অতীতের ঘটনাবলীর উপর নির্ভরশীল] ছাড়া অন্য কোন উপায়ে আমরা নিশ্চিত হতে পারি না। হিউমের বক্তব্য হলো, আমরা ইন্ডাক্টিভ উপায়ে যুক্তিতর্ক খাড়া করা ছাড়া অন্য কোন পথ পাচ্ছি না। অর্থাৎ বিষয়টি দ্রুব সত্য না হলেও এটাই আমাদের একমাত্র ভরসা। কিন্তু এটা আমাদের কৃষ্টি ও অভ্যেস থেকে জন্ম নিয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তার মতে এটা রেশন্যালী জাস্টিফাইড নয়। সুতরাং হিউম কর্তৃক ফেলে যাওয়া 'প্রবলেম অব ইন্ডাকশন' [problem of induction] হেতু বিজ্ঞান ও দর্শনে বিরাট প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে যার উপর তর্ক-বিতর্ক আজো চলছে।

চিন্তাখাদ্য: আপনি কী মনে করেন, নির্ভুল কোনো যুক্তিতর্ক আছে?

৪.খ. যুক্তিবিদ্যার প্যারাডক্স [paradox]: প্যারাডক্স শব্দটি দ্বারা এমন কিছু অবস্থার বর্ণনা জানা যায় যা মূলত সত্য হয়েও মিথ্যা বলে প্রতীয়মান হয়। লজিকে প্যারাডক্স একটি বিশেষ আকর্ষণীয় ব্যাপার। নিম্নে কয়েকটি গোলকধাঁধামূলক ঘটনা তুলে ধরছি। পাঠকরা এ থেকেই প্যারাডক্স শব্দটির অর্থ বুঝতে সক্ষম হবেন।

১. মৃতুদণ্ডের প্যারাডক্স: ঘোষণা হলো, 'আগামী সপ্তাহের শনিবারের মধ্যে দণ্ডিত কয়েদীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে এবং কয়েদীকে জানতে দেওয়া হবে না, যে দিন তাকে ফাঁসিতে ঝুলানো হবে।' কথাগুলো তীরের মতো বিদ্ধ হলো বেচারা কয়েদীর হৃদয়ে। কিন্তু সে খুব চালাক! চিন্তা করলো, 'ফাঁসির কাজ পরের সপ্তাহের শনিবারে হতে পারে না, কারণ আমি তা জানবো আগেই যদি শুক্রবার পর্যন্ত জীবিত থাকি। আর তারা বলেছেন, আমাকে ফাঁসির দিন জানানো হবে না। সুতরাং সর্বশেষ দিনটি হতে পারে শুক্রবার। কিন্তু তা হবে কি করে, আমি যদি বৃহস্পতিবার পর্যন্ত জীবিত থাকি, তাহলে তো আমি জেনে ফেলবো শুক্রবারে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী হবে। এভাবে বৃহস্পতিবারে হলে বুধবারে জেনে নেবো যে?' ... এরূপ বর্তমান পর্যন্ত ভেবে সে নিশ্চিত হলো, আমাকে ফাঁসি দেওয়া যাবে না! অন্তত তাদের নির্দেশ মুতাবিক আমার অজ্ঞাতে ফাঁসি দেওয়া অসম্ভব!

কিন্তু বেচারা কয়েদী অবাক হয়ে গেলো যখন দেখা গেলো পরবর্তী মঙ্গলবার জল্লাদ এসে তাকে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলো! পাঠকরা নিশ্চয় বিষয়টি বুঝতে পারছেন। দর্শনে এই কাহিনীকে বলে ভবিষ্যদ্বাণী প্যারাডক্স। এখানে ধারাবাহিক যুক্তিতর্কের মাধ্যমে এমন একটি ফলাফল বা কংক্লুশন পাওয়া গেছে যা মূলত ভুল। বেচারা কয়েদী জীবন দিয়ে তা আবিষ্কার করলো। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে প্যারাডক্স এমন কিছু যুক্তি যা মনে হয় সঠিক, কিন্তু যা থেকে

ফলাফল আসে স্ববিরোধী বা অগ্রহণযোগ্য। কোনো কোনো প্যারাডক্স এমনও আছে যাদের কংক্লুশন কোন্ কারণে ভুল হলো, তা বুঝাই মুশকিল। এসব ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে পুরো লজিককে পুনরায় পরীক্ষা-নীরিক্ষা জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। পূর্ব-বিশ্বাস, ধারণা, প্রেমিজ ইত্যাদি তলিয়ে দেখতে হয় কোথায় ভুলটি হয়েছে। যুক্তিতর্কের মধ্যেও কোন ভুল আছে কি না দেখতে হবে। স্বয়ং আর্গুমেন্টও নির্ভুল কিনা জানতে হবে। যেভাবে হোক, পশ্চিমা দার্শনিকরা বলেন, প্যারাডক্সকে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষা করা জরুরী, অন্যথায় স্বয়ং যুক্তিবিদ্যার উপর সন্দেহ, অপর্যাপ্ত দৃঢ়তা ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়বে- যা হবে পুরো দর্শনের জন্য ক্ষতিকর।

নীচে আরো এক দু'টো অনুরূপ প্যারাডক্স তুলে ধরছি। এগুলোর সমাধান দর্শনের দৃষ্টিতে উপস্থাপন চাট্টিখানি কথা হয়। এসব কাহিনী চিত্তাকর্ষক। অনেক বড় বড় দার্শনিকদের পর্যন্ত এসব গল্প ঘামিয়েছে।

২. নাপিত প্যারাডক্স [ও সমাধান]: এক গ্রামে বাস করতো বিদ্যুৎ নামক এক নাপিত। সে সকল লোকের দাড়ি কামাতো- কিন্তু তার একটা নিয়ম ছিলো যা সে কখনো পরিত্যাগ করতো না। নিয়মটা হলো, শুধুমাত্র যারা নিজেদের দাড়ি নিজেরা কামান না, তাদের দাড়ি সে কামাতো। এখন প্রশ্ন হলো বিদ্যুৎ নাপিতের দাড়ি কে কামাতো? সে যদি নিজে নিজে কামায়, তাহলে সে কামায় না! যদি সে কামায় না, তাহলে সে কামায়!

পাঠকরা বিষয়টি আঁচ করেছেন নিশ্চয়ই। এই প্যারাডক্সের সূত্রপাত বিদ্যুতের কাজের নিয়ম থেকে সৃষ্টি হয়েছে: 'সে একমাত্র ওসব লোকের দাড়ি কামায় যারা নিজেরা নিজেদের দাড়ি কামায় না'। এই কাজের নিয়মটি মনে হয় খুব সরল-সোজা কথা! কিন্তু আসলে তা নয়। বাস্তবে লজিকেলী এরূপ 'আইন' অসম্ভব। কারণ বিদ্যুৎ নাপিত নিজের সম্পর্কে স্ববিরোধিতা ছাড়া এরূপ আইন করতে পারে না- সে হয় ঐ দলের হতে

হবে যারা দাড়ি নিজেরা কামায়, না হয় যারা কামায় না। কিন্তু দাড়ি কামানেওয়ালা নাপিত বিদ্যুৎ লজিকেলী অস্তিত্বশীল হতে পারে না। সুতরাং বিদুৎ বলতে কোন নাপিত নেই! প্যারাডক্সের সমাধান এটাই।

৩. রাসেল প্যারাডক্সঃ উপরোক্ত নাপিত প্যারাডক্সের গুরুত্ব এর ব্যাখ্যার মধ্যে নয়, তার ধারণার মধ্যে বিদ্যমান। তবে কাঠামোগতভাবে এই প্যারাডক্সটি আরো গুরুত্বপূর্ণ একটি গাণিতিক প্যারাডক্সের মতো। এর নাম 'রাসেল প্যারাডক্স'। শত বছর পূর্বে বৃটিশ গাণিতিক ও দার্শনিক বেট্রান্ড রাসেল [১৮৭২-১৯৭০] এটি উপস্থাপন করেছিলেন। শুরুর দিকে এই প্যারাডক্সের সমাধান এতো কঠিন ও দৃশ্যত অসম্ভব ছিলো যে, এটি স্বয়ং গণিতশাস্ত্রের মূলকে পর্যন্ত উপড়ে ফেলার হুমকি খাঁড়া করে ফেলেছিল। রাসেল এ সম্পর্কে নিজেই লিখেছেন,

"The point of philosophy is to start with something so simple as not to seem worth stating, and to end with something so paradoxical that no one will believe it. - Betrand Russell, 1918"

এ প্রসঙ্গে কঠিন এই গাণিতিক প্যারাডক্সটির কথা বললাম মাত্র। এর পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদানের সাহস করবো না! তবে একথা জানা থাকা দরকার যে, এই প্যারাডক্সের আবিষ্কারক স্বয়ং রাসেলও সমাধান খুঁজে পান নি- অবশ্য পরবর্তিতে সমাধান পাওয়া গিয়েছিল। ঠিক নাপিত প্যারাডক্সের মতো এটাও শেষ পর্যন্ত লজিকেলী অসম্ভব যুক্তিতর্কের উপর নির্ভরশীল বলে প্রমাণিত হয়- বেঁচে যায় গণিতের মূল!

৪. মিথ্যুক প্যারাডক্সঃ ঘটনার সূত্রপাত গ্রীসে, সে-ই খ্রীস্টপূর্ব সপ্তম শতকে। ক্রিটান চিন্তাশীল এপিমেনিডেস একদা বললেন, **'সব ক্রিটান**

মিথ্যুক!'। কথাটি শোনতে মনে হয়, তিনি নিজের জাতির উপর খুব রাগান্বিত হয়েছিলেন। রাগের অতিশয্যে সে কথা ভুলে যান, তিনি যে নিজেই একজন ক্রিটান! এই স্ববিরোধিতাই প্যারাডক্স। মিথ্যুক হয়ে সত্য কথা বললেন কিভাবে? **'বাক্যটি ভুল'** যদি [এ বাক্যটি] সত্য হয় তাহলে তা মিথ্যা! আর যদি মিথ্যা হয় তাহলে তা সত্য!

এ প্যারাডক্স বুঝতে একখণ্ড কাগজের এক পৃষ্ঠায় [পৃ.১] লিখুন, **"কাগজের অপরদিকের বাক্যটি ভুল।"** এবার কাজগটি উল্টিয়ে [পৃ.২] লিখুন, **"কাগজের অপরদিকের বাক্যটি সত্য"**। এখন পৃ.১ এর বাক্য সত্য হলে তা সত্যায়িত হবে পৃ.২ এর বাক্য দ্বারা। কিন্তু পৃ.১ এর বাক্য দ্বারা বুঝানো হচ্ছে পৃ.২ এর বাক্যটি সত্য নয়- সুতরাং কিভাবে পৃ.১ এর বাক্য সত্যায়িত হবে? ব্যাপারটি কেমন বিভ্রান্তিকর বুঝতে পেরেছেন কি? কেউ কেউ বলেন উভয় বাক্য মূলত অর্থহীন। কিন্তু আসলে তা কিভাবে হবে? এগুলোর তো অর্থ আছে।

৫. গ্রেলিংস প্যারাডক্স: এটা স্বয়ং অর্থপূর্ণ শব্দের প্যারাডক্স। যেসব শব্দ নিজেরাই নিজেকে বুঝায় এগুলোকে বলে অটোলকিজেল ওয়ার্ডস্ [autological words]: যেমন 'pentasyllabic' এখানে শব্দটির মধ্যেই পাঁচটি সিলেবুল আছে [e,a,y,a এবং i]। পেন্টা মানে পাঁচ। অপর আরেকদল শব্দ আছে যাদের নামকরণ হয়েছে 'heterological words': এদের বৈশিষ্ট্য হলো নিজেদের বৈশিষ্ট্যকে তারা নিজেরা ব্যাখ্যা করে না: যেমন, 'long' যা নিজেই আসলে 'short'। সুতরাং ইংরেজি অভিধানের প্রতিটি শব্দ এই দু'টির মধ্যে যে কোন এক দলের অন্তর্গত হতে হবে। এখন ভাবুন: শব্দ 'heterological' স্বয়ং কি 'heterological'? যদি হয়ে থাকে তাহলে, তা নয়! যদি না হয়, তাহলে তা হয়! সে-ই বিদ্যুৎ নাপিত সমস্যা আবার! তার দোকান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপায় নেই দেখছি, শেষ পর্যন্ত!

৬. সরিটিস প্যারাডক্সঃ মনে করুন [যদি আপনার ক্ষেত্রে মনে করা জরুরী হয়- আমার (লেখকের) ক্ষেত্রে জরুরী!] আপনার মাথাটি চুলে পরিপূর্ণ। এর অর্থ, হয়তো আপনার আছে এক লক্ষের মতো একক চুল। এবার আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি, একটিমাত্র চুল উপড়ে ফেলেন! এতে কি আপনি বল্ড [টেকো] হয়েছেন? অবশ্যই নয়- বলবেন আপনি। একটিমাত্র চুল কিভাবে পার্থক্য সৃষ্টি করবে? ৯৯,৯৯৯ একক চুল মিলে আমার মাথাটি এখনও পূর্ণ চুলভর্তি মাথা বুঝায়।

অবশ্যই, আমরা সবাই একমত হবো, আপনি যদি বল্ড না হোন এবং একটি মাত্র চুল তুলে ফেলার কারণে কখনো আপনি বল্ড হতে পারেন না। এবার ভাবুন, আপনি আরেকটি চুল তুলে ফেললেন! এখনও বাকী থাকবে ৯৯,৯৯৮ একক চুল। আরো একটি টেনে ফেলুন! এরপর আরো একটি, এরপর ... আপনি যদি যথেষ্ট সময় এভাবে চুল তুলতে থাকেন একটা একটা করে, অবশেষে মাথায় একটিও চুল আর থাকবে না! তখনও কি আপনি বল্ড না থাকতে পারবেন? অবশ্যই না। সুতরাং দৃশ্যত আপনি একটি নিশ্চিত চুলভর্তি মাথা থেকে নিশ্চিত হিথরো বিমানবন্দরের মতো পুরোদমে বল্ড হলেন একটি ধারাবাহিক কার্যসিদ্ধির মাধ্যমে [অর্থাৎ একটার পর একটা চুল উপড়ে দিয়ে]। অথচ একক এরূপ একটি মাত্র কাজ দ্বারা কখনো আপনি বল্ড হতে পারেন না। তাহলে ঠিক কখন আপনি বল্ড হলেন?

গ্রীক লজিশিয়ান মিলেটাসের ইউবিলাইডিস এই প্যারাডক্সের আবিষ্কারক। একে 'সরিটেস' [sorites] প্যারাডক্স বলে। মূল গল্পে একটিমাত্র বালুকণা ক্রমান্বয়ে বাড়ানোর কথা এসেছে [উপরের চুল কমানোর মতো নয়- তবে ব্যাপারটি মূলত অনুরূপ]। আর্গুমেন্টটি এভাবে তুলে ধরা হয়েছে:

১টি বালুকণা একমুষ্টি হয় না।

যদি ১টি বালুকণা একমুষ্টি না হয়, তাহলে ২টি বালুকণায়ও হবে না।

যদি ২টি বালুকণা একমুষ্টি না হয়, তাহলে ৩টি বালুকণায়ও হবে না।
[এবং ... ইত্যাদি ঐ পর্যন্ত ...]
৯৯,৯৯৯টি বালুকণা একমুষ্টি না হয়, তাহলে ১,০০,০০০টি বালুকণায়ও হবে না।

সুতরাং লক্ষ বালুকণায়ও দেখা যায় একমুষ্টি পরিমাণও বালু হবে না! মোটকথা, এখানে দৃশ্যত মনে হয় কখনো একমুষ্টি পরিমাণে আমরা পৌঁছতে পারবো না। কিন্তু তা কি আপনি মানবেন? কখনো নয়। সুতরাং ভুলটি কোথায় হলো?

উপরের কংক্লুশন নিশ্চয়ই সঠিক নয়। মূল প্রেমিজ বা প্রতিজ্ঞার মধ্যে নিশ্চয় কোন ভুল আছে যার উপর ভিত্তিকরে এই আর্গুমেন্টের জন্ম। না হয়, আমাদের যুক্তির মধ্যে মারাত্মক কোন ক্রুটি আছে। কিন্তু সেটি কি? বাস্তবে এই প্রাচীন প্যারাডক্সের সঠিক সমাধান এখনো কেউ দেন নি! অনেক প্রস্তাব যুগ যুগ ধরে এসেছে অবশ্যই। কেউ কেউ বলেছেন, এটা গ্রহণ করতে হবে, বালুকণা বৃদ্ধি করাকালে কোন এক সংখ্যায় পৌঁছলেই পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে মেনে নিতে হবে। অন্যকথায় বালুকণার সংখ্যার নির্ধারিত মাত্রা আছে যার দ্বারা একমুষ্টি বালু হলো কি না তা নির্দিষ্ট করা যায়। ওজন দ্বারাও আমরা প্যারাডক্সের সমাধান খুঁজতে পারি। প্রথমে একমুষ্টি বালু হাতে নিয়ে তা ওজন করে নিলাম। এরপর একটি বালুকণা মুষ্টি থেকে ফেলে দিয়ে পুনরায় ওজন কলাম [এভাবে অত্যাধুনিক ডিজিটেল ওজনযন্ত্রদ্বারাও মেপে একটি দানার ওজন কতটুকু তা জানা যাবে কি না- সেটা আরেক প্রশ্ন। ধরে নিলাম, আমরা এই ক্ষমতাও রাখি।] পার্থক্য থেকে আমরা বলতে পারি এতো সংখ্যক বালুকণা মিলে হবে একমুষ্টি বালু। আর কম হলে হবে না। কিন্তু এই সমাধান প্রাকটিকেল কি না সে প্রশ্ন ভিন্ন। মোটকথা, এরূপ সীমা নির্ধারণ দ্বারা কথায় প্যারাডক্সের সমাধান হয়ে গেছে মনে হলেও অনেক প্রশ্ন থেকে যায়। প্রাকটিকেল সমস্যা ছাড়াও আর্গুমেন্ট বা তর্কের সমস্যা আছে।

প্রত্যেকের মুষ্টির আয়তন বা ধারণক্ষমতাও একই নয়। আমরা কিভাবে নির্ধারণ করবো যে, এটুকু বালুতে একমুষ্টি হবে? সুতরাং এরূপ সমাধান মূলত চেষ্টা বৈ নয়।

সরিটেস প্যারাডক্স শুধু চুলশূন্য মাথা আর একমুষ্টি বালুকণার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দৃশ্যত আমাদের অনেক ধারণাও অনুরূপ প্যারাডক্সে পরিপূর্ণ। যেমনঃ লম্বা-বেটে, বড়-ছোট, ধনী-গরীব, মেদী-মেদহীন ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়। এসব ক্ষেত্রে কোথায় সীমারেখা নির্ধারণ করবো? ভাবার বিষয় নয় কি? আলফ্রেড নর্থ হুয়াইটহেডের [১৮৬১-১৯৪৭] ভাষায়ঃ “There are no whole truth; all truths are half-truths. It is trying to treat them as whole truths that plays the devil - Alfred North Whitehead”। অপর আরেক আধুনিক চিন্তাশীল বলেনঃ “As complexity rises, precise statements lose meaning and meaningful statements lose precision - Lofti Zadeh, 1965”।

‘প্রতিটি প্রপজিশন হয় সত্য না হয় মিথ্যা’- ক্লাসিক লজিকের এই কথাটি কতটুকু সত্য? আমাদেরকে এ প্রশ্ন করতেই হবে। উপরের টেকো মাথা সম্পর্কে আমরা বলতে পারি, ‘একদল মানুষ আছেন যারা অবশ্যই বল্ড হিসাবে বিবেচিত। অপর আরেকদল আছেন যারা বল্ড নন। উভয়ের মাঝে একদল অবশ্যই আছেন যাদেরকে হয় বল্ড বা বল্ড নয়- এ উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা যায়। এরাই সীমারেখার অধিবাসী। সুতরাং লজিকেলী সর্বদা এই কথাটি নির্ভেজাল সত্য বলা ঠিক হবে নাঃ **“x হলেন বল্ড”**। তিনি যদি সীমারেখার অধিবাসী হন, তাহলে বিপরীত কথা তথাঃ **“x বল্ড নন”**- এ কথাটিও লজিকেলী সত্য হতে পারে। আর একই সময় কোনো ব্যাপার ‘সত্য’ এবং ‘মিথ্যা’ এ উভয়টি তো হতে পারে না! অথচ দৃশ্যত এখানে এই কথাটিই বাস্তব বলে মনে হয়। এই গবেষণা থেকে এটা বলা যায়, ক্লাসিকেল লজিকের সাথে কিছুটা টেনশন সৃষ্টি হয়েছে। এ

টেনশন মূলত স্বভাব-ভাষার সঙ্গে। এ থেকে উত্তরণকল্পে আধুনিক পশ্চিমা দার্শনিকরা এ্যারিস্টটলিয়ান লজিককে নতুন ধাঁচে সাজানোর চেষ্টা করছেন। কেউ কেউ নতুনভাবে সাজানো মাল্টিলেভেল [একাধিক স্তরে বিন্যস্ত] লজিকের নামকরণ করেছেন, **"ফাজি লজিক"** [fuzzy logic]। বাংলায় বলা যায়, **'অস্পষ্ট যুক্তিবিদ্যা'**। নিম্নে এই লজিকের ব্যাখ্যা তুলে ধরছি।

ফাজি লজিক: ফাজি [fuzzy] শব্দের অর্থ অস্পষ্ট। লজিক অস্পষ্ট হওয়া? এটা মানা কঠিন। কারণ ঐতিহ্যগতভাবে এটা মেনে নেওয়া হয়েছে: লজিকে শুধুমাত্র দু'টি ভেল্যু [value] গ্রহণযোগ্য। প্রতিটি প্রপজিশন [proposition] হতে হবে **সত্য** কিংবা **মিথ্যা**। তৃতীয় কেনো প্রপজিশন লজিকে নেই। কিন্তু উপরে ব্যাখ্যাত সরিটেস প্যারাডক্স থেকে স্পষ্ট, স্বাভাবিক ভাষার জটিলতা ও কাঠিন্যতাকে লজিকের আওতাভুক্ত আনা সুকঠিন হবে যদি না লজিকের উপরোক্ত দৃঢ়-আইনকে কিছুটা ঢিলেঢালা করা যায়। লফটি যাদেহ নামক একজন কম্পিউটার বিজ্ঞানী সমাধানের প্রস্তাব দিয়েছেন। তার এই সমাধানকেই বলে 'ফাজি লজিক' [উপরের উদ্ধৃতিটি দেখুন]। তার এই লজিকে সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে ডিগ্রী বা মাত্রা সংযুক্ত হয়েছে। সুতরাং 'সত্য' [truth] ও 'মিথ্যা' [false] এর মাত্রা নিধারণ করে, যথাক্রমে সংখ্যা ১ ও ০-এর দ্বারা। ১ ডিগ্রীর হলে তা সত্য এবং ০ ডিগ্রী মানে মিথ্যা। মাঝখানে অবশ্য অসংখ্য ডেসিমেল পয়েন্ট আছে। যেমন আমরা বলতে পারি, এই সত্যটি সত্য হওয়ার ডিগ্রী বা মাত্রা ০.৮ পর্যন্ত। আর এটি মিথ্যা হওয়ার ডিগ্রী বা মাত্রা ০.২ ডিগ্রী মাত্র। মোটকথা, সত্য-মিথ্যাকে পার্সেন্ট বা শতাংশ দ্বারা মাপার চেষ্টা এটা। মনে করবেন, সত্য ও মিথ্যা এভাবে মাপা আদৌ যুক্তিহীন। ঠিক তা নয় কিন্তু। আধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধি [artificial intelligence - AI] বিজ্ঞান গবেষণায় এটি ব্যবহৃত হচ্ছে! অবশ্য এসব গবেষণায় তথাকথিত কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন কম্পিউটার সফ্টওয়্যারকে আমাদের

প্রাত্যহিক ব্যবহৃত নেচারেল [সময় সময় অস্পষ্ট] ভাষাকে ‘বুঝতে’ হবে এরূপ সত্য-মিথ্যার ডিগ্রী যাচাই-বাছাই করে। কিন্তু সত্যিকার দার্শনিকরা এখনো ফাজি লজিক মেনে নিতে নারাজ। এটা মানার অর্থই হলো এ্যারিস্টটলের সৃষ্ট আড়াই হাজার বছর পুরাতন লজিকের বিসর্জন! এটা কি কখনো ভাবা যায়? আমার প্রশ্ন কেনো ভাববো না? উপরোক্ত সরিটেস প্যারাডক্সের ব্যাপ্তি ও সমস্যা স্পষ্ট ইঙ্গিত করে এ কথাটির প্রতি, “দর্শনের নির্যাস, মূল বা মেরুদণ্ড নামে খ্যাত ‘লজিক’ মূলত শতভাগ নির্ভেজাল আছে কি না তা সন্দেহযুক্ত।”

ভাবতে পারেন লফটি যাদেহ কর্তৃক উপরোক্ত ‘ফাজি লজিক’ লজিককে বাঁচিয়ে দেবে, দার্শনিকরা মেনে নিলেও। আমি মনে করি তা মোটেই নয়। কারণ, এর দ্বারা প্রমাণ হয়ে যায়, লজিক মৌলিকভাবেই নির্ভুল নয়। এর দ্বারা সৃষ্ট অনেক দার্শনিক থিওরী এখন প্রশ্নবিদ্ধ। লজিকের মধ্যে আরেক ‘ফাজি লজিক’ শাখা রাখা যায় কি না তা আজকের [পশ্চিমা] দার্শনিকদেরকে তলিয়ে দেখতে হবে। অন্যথায় রাসেল প্যারাডক্সের কারণে যেভাবে পুরো গাণিতিক লজিক ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়েছিল- অনুরূপভাবে দর্শনের লজিক সিস্টেম ঠিকে থাকা হয়তো কঠিন হয়ে পড়বে! এ অবস্থা সৃষ্টি একেবারে অবান্তর নয়। আমরা এখানে যেসব দৃশ্যত ভাষাগত সমস্যার কথা উল্লেখ করেছি তার চেয়েও আরো জটিল কিছু সমস্যা পরবর্তিতে ব্যক্ত করবো। এসব জটিলতাও ক্লাসিক লজিকের দৃঢ়তাকে নড়বড়ে করে দিতে সমর্থ। পশ্চিমা দার্শনিক যেমন বের্ট্রান্ড রাসেল এসব সমস্যা নিয়ে জীবনভর গবেষণা করেছেন এবং সম্ভাব্য সমাধান খুঁজেছেন। তিনি যে একশত পার্সেন্ট সফল হয়েছেন তা নিশ্চিত নয়- শুধু সময়ই বলবে তার সফলতার ডিগ্রী বা মাত্রা কতটুকু।

চিন্তাখাদ্যঃ যদি এটা হয়, তাহলে তা নয়! যদি এটা না নয়, তাহলে তা হয়! এই লজিক আপনি কতটুকু বুঝতে পেরেছেন? বিশুদ্ধ লজিক বা যুক্তিবিদ্যা বলতে কিছু আছে নাকি- আপনি কি মনে করেন? উপরের লজিকেল প্যারাডক্সগুলোর মতো নিজে কিছু প্যারাডক্স সৃষ্টির চেষ্টা করুন।

৪.গ. পারস্যের সম্রাট বল্ড: মনে করুন আমি আপনাকে বললাম, 'পারস্যের সম্রাট বল্ড (টেকো)'। কথাটি দ্বারা আমাকে আপনি পাগল ভাবতে পারেন। অথবা আমার জ্ঞান খুব সীমিত মনে করবেন। কিন্তু যা বললাম, তা কি বাস্তবেই মিথ্যা? মনে করুন তা মিথ্যাই। তাহলে লজিকেলী বলছি, বিপরীত কথাটি তথা, "পারস্যের সম্রাট বল্ড নন" সত্য। তবে এটাও সত্য হওয়ার ব্যাপারে কোনো নিশ্চয়তা নেই। এ ক্ষেত্রেও আপনি বললেন, তুমি জানো না! তাহলে এই উভয় দাবী হয়তো 'সত্যও নয় কিংবা মিথ্যাও নয়!'। উভয় কথাটি মূলত সাধারণ অস্পষ্ট বাক্য মাত্র। কিন্তু, যদিও এরূপ বলা সচরাচর হয় না- কিন্তু কথাগুলো তো বাস্তবে অর্থহীন নয়। দর্শনে এরূপ 'বকবক' নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার কিন্তু! বিষয়টি দ্বারা আমরা কোথায় যাচ্ছি তা একটু পরই উন্মোচন হবে।

দার্শনিকরা উক্তরূপ বকবক দ্বারাই গড়ে তুলেন প্রতিপাদ্য, প্রেমিজ, থিওরী ইত্যাদি। আর পারস্যের সম্রাট? তিনি বল্ড কি না এ নিয়ে তো গত শত বছর যাবৎ দর্শনজগতে চলছে গরম গরম সংলাপ। যদিও হাজার বছরের অধিক সময় পার হয়ে গেছে পারস্য সাম্রাজ্য পতনের। অবশ্য বৃটেনে এই সমস্যাকে 'ফ্রান্সের বাদশাহ বল্ড' সমস্যা বলে। এখানে পারস্যের সম্রাটের বদলে ফ্রেঞ্চ কিং বলা হয়েছে- এই যা।

সমস্যাটা আসলে কোথায়? সমস্যাটা মূলত কথার মধ্যে- একুশ শতকে এসে আপনি বর্তমান কালে বলেছেন, "পারস্যের সম্রাট বল্ড!" এটা তো ভুল। বল্ড না বলে 'বল্ড ছিলেন' হতো সত্য- যদি ইতিহাস দ্বারা প্রমাণ করা যায়। কিন্তু এটা আসল পয়েন্ট নয় এখানে। আমরা কিভাবে এ বাক্যটিকে মিথ্যা বা সত্য প্রমাণ করবো- সেটাই সমস্যা। দৃশ্যত মনে হয় "পারস্যের সম্রাট বল্ড নয়" কথাটি সত্য হবে- কারণ প্রথম বাক্যটি সত্য হতে পারে না। আর লজিকে যে কোন বাক্য সত্য কিংবা মিথ্যা হতে পারে, তৃতীয় কিছু হতে পারে না। ক্লাসিকেল লজিকের একটি আইন

আছে- এর নাম 'law of excluded middle'। এর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে তা দৃষ্টান্ত থেকে বুঝা অনেকটা সহজঃ 'যদি K হয় L' ভুল হয়, তাহলে 'K নয় L' সত্য হতে বাধ্য। কিন্তু উপরোক্ত বাক্য দু'টি দৃশ্যত এই আইন মানছে বলে মনে হয়। কারণ, শেষোক্ত বাক্য, "পারস্যের সম্রাট বল্ড নয়" কথাটি সত্য নয় বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। কারণ এখানেও ব্যবহৃত হয়েছে বর্তমান কাল। যে কোন কথা সত্য ও মিথ্যা উভয়টি হতে পারলে লজিকের বারোটা বেজে যাবে। তাহলে সমস্যাটি কোথায়?

ইংরেজ দার্শনিক বেট্রান্ড রাসেলের মতো চিন্তাশীলরাও এ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন অনেক দিন। তিনি এ থেকে যে দার্শনিক থিওরী জন্ম দেন তার নাম 'থিওরী অব ডিসক্রিপশন্স' [Theory of description]। ১৯০৫ সালে 'On Denoting' শিরোনামে রচিত তার একটি লেখায় এটা প্রকাশিত হয়। এই থিওরী এবং সমকালীন ইংরেজদের কর্তৃক আরো বেশ ক'টি থিওরী, ব্যবহৃত ভাষার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গবেষণা ও এর লজিকের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। থিওরিস্টরা মনে করতেন, ভাষার মাধ্যমে জগত সম্পর্কিত জ্ঞানার্জনের হয়তো একমাত্র পথ এটাই।

রাসেল মনে করেন, উপরের সমস্যার সমাধান হলো উভয় বাক্যকে "নির্দিষ্ট ব্যাখ্যামূলক" হিসাবে মনে না করা। বাহ্যতঃ এসব বাক্য নির্দিষ্ট অর্থবোধক মনে হলেও আসলে তা প্রতারণামূলক। ব্যাকরণের দিক থেকে এগুলো সঠিক ঠিকই [এসব বাক্যকে বলে সাবজেক্ট-প্রেডিকেট বাক্য]। কিন্তু তাদের মধ্যে লজিকেল ফর্ম অনুপস্থিত। আর লজিকেল কাঠামোই নির্দিষ্ট করে কোনো বাক্য [লকিজেলী] সত্য না মিথ্যা। আমার ব্যক্তিগত মতামত হলো, সম্ভবত ইংরেজি ভাষায় কোনো মৌলিক সমস্যা বিদ্যমান! হয়তো বক্তা জেনেশোনে অতীতে বেঁচে থাকা এক ব্যক্তির মাথায় চুল ছিলো কি না, বলতে যেয়ে ভুলে বা অতীতকে ভাষার ভুলের কারণে বর্তমানে নিয়ে এসেছেন। অতীত কালের ব্যাখ্যা বর্তমানকালে তুলে ধরার

টলারেন্স ইংরেজি ভাষায় কেনো দেওয়া হলো? এটাই প্রশ্ন। ভাষার ব্যাকরণবিদরা যতি বলতেন, অতীতে বেঁচে থাকা কোন ব্যক্তি বা কোন বিষয়ের ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য অতীত কালে না বললে তা হবে ভুল- তাহলে ঐ বেচারা বাধ্য হয়ে বলতো, The King of France was bald। সমস্যার সূত্রপাতই তখন ঘটতো না। লজিকেলী কোন সমস্যা নেই- শুধু একটি ছাড়া, মহামান্য বাদশা ঠিকই বল্ড ছিলেন কি না তা সত্যায়ন করা। অবশ্য এজন্য বৃটিশ মিউজিয়াম তো আছেই!

চিন্তাখাদ্য: লজিকে ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? দেখা যায় ভাষা ব্যবহারের ঐতিহ্য থেকেই মানুষ সৃষ্টি করেছে অনেক স্ববিরোধিতা। আর এ থেকে গড়ে ওঠেছে ভাষা সৃষ্টির বিজ্ঞান তথা ব্যাকরণ। মনে হয় ব্যাকরণবিদরা ভালো লজিশিয়ান ছিলেন না! অন্তত ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রে তা-ই সত্য বলে প্রতীয়মান হয়। আপনি কি মনে করেন? লজিক সঠিক রাখতে যেয়ে ভাষাকে বদলাবেন, নাকি ভাষা সঠিক রাখতে যেয়ে লজিক বাদ দিবেন? না, লজিককে সম্পূর্ণরূপে কবরস্থ করবেন?

৫. ধর্মদর্শনে আধুনিক পশ্চিমা চিন্তা-চেতনা

পশ্চিমা ধর্মদর্শন মূলত খ্রিস্ট-ইয়াহুদী ধর্মগ্রন্থে লিখিত “ঐশীসূত্র” নির্ভর দর্শন। সুতরাং এ থেকে সার্বিকভাবে পাঠকরা কতটুকু উপকৃত হবেন বা না, তা ভেবে এ পুরো অধ্যায়টি বাদ দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পশ্চিমা দার্শনিকরা কিভাবে আজকাল ধর্মদর্শনকে উপেক্ষা, অবিশ্বাস বা এমনকি এ নিয়ে কটাক্ষপূর্ণ মন্তব্য পর্যন্ত করে থাকেন তা-ও জানা থাকা দরকার। এটুকু বিবেচনা করে নিম্নের পৃষ্ঠাসমূহে এ সম্পর্কিত কিছু আলোচনার প্রয়াস। পাঠকরা এ অংশ পাঠের সময় বুঝতে সক্ষম হবেন, মানব-সৃষ্ট তথাকথিত বাইবেলের কিছু বক্তব্যকে “ঐশীবাণী” মনে করে কিভাবে ধার্মিক চিন্তাবিদরা আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞানের হাতে মার খাচ্ছেন। তবে পশ্চিমা দর্শনে এখনো যে খ্রিস্ট-ইয়াহুদী চিন্তা-চেতনার জায়গা [তা যতো কম বা প্রভাবহীন হোক] বিদ্যমান আছে, তা-ই আমাদের নিকট অবাক হওয়ার ব্যাপার।

দর্শনে ইয়াহুদী-খ্রিস্টবাদী বিশ্বাসের অত্যল্প স্থান এখনও দখলে থাকার কারণ তিনটি হতে পারে: ১. দর্শনে ইয়াহুদী-খ্রিস্টবাদী ঐতিহ্য। সেন্ট থমাস একুইনাক্স [১২২৫-১২৭৪], সেন্ট অগাস্টিন [৩৫৪-৪৩০], মাইমোনাইডিস [১১৩৫-১২০৪], সেন্ট আনসেল্‌ম [১০৩৩/৩৪-১১০৯] প্রমুখ দার্শনিকের জীবনভর গবেষণা কি এতো সহজে সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলা সম্ভব? ২. এখনো খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসী [তা যতো ক্ষীণ হোক না কেন] পৃথিবীর জমিনে অসংখ্য মানুষ জীবিত আছেন। তাদের আক্বীদা-বিশ্বাসকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা দার্শনিকদের পক্ষে আদৌ সম্ভব হচ্ছে না। ৩. অপর যে কারণটি আমি খুঁজে পাচ্ছি, তাহলো আধুনিক যুগে বিজ্ঞান ও দর্শনের পশ্চিমা গবেষকবৃন্দের অনেকেই ইয়াহুদী কিংবা খ্রিস্টান হওয়া। এই পয়েন্টটি কতটুকু যুক্তিসম্পন্ন তা অনেকের নিকট প্রশ্নসাপেক্ষ হতে পারে। এমনকি মহাত্মন চিন্তাবিদরাও হয়তো এখানে আমার সঙ্গে একমত হবেন

না। এ যুগের মহান বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন ইয়াহুদী ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি মাঝে মধ্যে সিনোগগেও যেতেন এবং গর্বভরে বলতেন আমি প্রভুবিশ্বাসী। এ থেকে এটাই ধরে নিতে পারি, পশ্চিমা দার্শনিকদের অধিকাংশই অন্তরে চেয়েছেন, যুক্তিবাদের সঙ্গে নিজেদের ধর্মবিশ্বাসকে বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে গ্রহণযোগ্য- বা বলা যায়, বিষয় দু'টোর সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল করা। আর এটাই তারা চেয়েছেন। কিন্তু চাইলে কি হবে?

দর্শন ও বিজ্ঞানের সঙ্গে ইয়াহুদী-খ্রিস্টবাদী [মূলত শক্তিশালী চার্চের] সংঘাত ঐতিহাসিক- তা সবার জানা। সে-ই **'পশ্চিমা অন্ধকার'** মধ্যযুগ থেকেই এই বিবাদ চলে আসছে। বাইবেলে নিজেদের মনগড়া কিছু উদ্ভট কথা সংযুক্ত করার ফলে এই সংঘাতের সূত্রপাত ঘটে। যেমনঃ পৃথিবীকেন্দ্রিক বিশ্ব, পৃথিবী মহাকাশে স্থির, মাত্র ৬ বা ৭ হাজার পৃথিবী-বছর পূর্বে জগতসৃষ্টি হয়েছে বলে বিশ্বাস! ইত্যাদি আরো অনেক কথা বাইবেলে খুঁজে পাওয়া যায়, যা সে-ই মধ্যযুগ থেকেই বিজ্ঞান ও দর্শনের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধিয়েছিল।

সর্বশেষ নবী ও তাঁর মাধ্যমে প্রভুর মনোনীত শেষ ও মহাসত্যের ধর্ম ইসলাম এসে পূর্বেকার যাবতীয় 'মানব-মিশ্রিত কিতাবী' ও 'মানবতৈরী' ধর্মবিশ্বাস বাতিল করে দিয়েছে। এ সত্যের প্রমাণ হিসাবে উপরোক্ত 'বাতিল কথাগুলো' কুরআন কিংবা হাদীসে নেই- একথা নির্দ্বিধায় ঘোষণা দিতে পারি। শুধু আমি কেনো, এ ঘোষণা দিচ্ছেন কিছু পশ্চিমা অমুসলিম মনীষীরাও। সুতরাং ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞান ও দর্শনের কথিত সংঘাত ইসলাম ছাড়া যাবতীয় মানব-মিশ্রিত কিতাবী বা নিষ্কলুষ মানবতৈরী ধর্মবিশ্বাস-সমূহের সঙ্গে। এ ক্ষেত্রে ইসলাম স্বতন্ত্র। সত্যের সঙ্গে সত্যের সংঘাত হওয়া লজিকবিরোধী। ইসলাম সত্যধর্ম। এর সঙ্গে যদি কোন দৃশ্যত বৈজ্ঞানিক কিংবা দার্শনিক সংঘাত পরিলক্ষিত হয় তাহলে এর কারণ একটাই হতে পারে- ঐ বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক লজিক, তথ্য কিংবা থিওরী

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই নির্ভুল নয়। এর একটি শক্তিশালী প্রমাণ হলো, বিজ্ঞান ও দর্শনের দীর্ঘ ইতিহাস।

ঘেঁটে দেখুন, কিভাবে যুগে যুগে উভয় জ্ঞানান্বেষা থেকে প্রতিষ্ঠিত 'সত্য তথ্য' পরবর্তিতে ভুল বা অমূলক বলে প্রমাণিত হয়েছে। আজো হচ্ছে। ভবিষ্যতেও হবে। আর যে সমস্ত ব্যাপার যেমন সূর্য ও পৃথিবীর ঘূর্ণন ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গে অন্য কোন ধর্মবিশ্বাসের যেমন খ্রিস্টবাদ, সংঘাত বাধতে পারে- কিন্তু ইসলামের সঙ্গে নয়। যেসব এবস্যুলুট ট্রুথ বিজ্ঞান কর্তৃক এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে তার প্রমাণ [সরাসরি কিংবা ইঙ্গিতে] পবিত্র কুরআন ও হাদীসে নববীতে মিলছে। অন্তত এসব সত্যবিরোধী কিছু খুঁজে পাওয়া যায় নি। যাবেও না। তাহলে শুধুমাত্র ঐশীনির্ভর মহাসত্যের ধর্মবিশ্বাস একমাত্র ইসলাম- আর বাকী সবই মানবসৃষ্ট কিংবা ঐশী-মানবসৃষ্ট মিশ্রিত ধর্মবিশ্বাস। আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রচণ্ড হামলার শিকার হয়েছে ওসব ধর্মবিশ্বাস- তা কিন্তু আশ্চর্যের কিছু নয়। এসব ধর্মবিশ্বাসের মূলই তো নড়বড়ে- সত্যবিচ্যুত!

দর্শন ও ধর্মবিশ্বাসের কথিত সংঘাত ও আমাদের কথা: পশ্চিমা রেশনালিজম [চরম যুক্তিবাদ] দ্বারা প্রভাবিত ধর্মদর্শনের প্রায় সবটুকুই মূলত, [তাদের ভাষায়] 'Does God exist: if so, what His role in human lives?' -এ পশ্নকেন্দ্রিক। দার্শনিকদের এই প্রশ্ন উত্তাপনও কিন্তু আমাদের ধারণায় মূলত একটি যুক্তিহীন প্রেমিজের [প্রতিজ্ঞার] উপর নির্ভরশীল। প্রশ্নটি যুক্তিহীন বলার কারণ হলো, "দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের সামনে কোনো সূত্র ছাড়া মূলত কোনো থিওরী প্রতিষ্ঠা হয় না। এখানে সূত্র অর্থ, পূর্ব-বিশ্বাস বা প্রেমিজ। প্রকৃতির সার্বিক সৃষ্টিকৌশল ও মানবের মতো বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণীসহ প্রাণবন্ত এই পৃথিবীর অস্তিত্ব, সৌরজগতে সঠিক স্থানে অবস্থান এবং আরো শত শত 'যদি' সঠিক হওয়ার কারণে আমরা এখন নিজেদের ও প্রভু সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারছি। সুতরাং, প্রভু

আছেন কি না, সে প্রশ্নের অনুসন্ধানের পূর্বশর্ত হলো প্রভু আছেন বলে প্রথমে বিশ্বাস রাখা। এরপর গবেষণার মাধ্যমে তলিয়ে দেখা, তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ। মোটকথা, প্রথমেই যদি বলি লন্ডনে, মিস্টার এক্স নেই- আর এরপর গবেষণা শুরু করি মিস্টার এক্স লন্ডনে আছেন কি না! এটা কোনো যুক্তিবিজ্ঞানের কথা হলো?"

মূলত, অবিশ্বাসী দার্শনিকরা উপরোক্ত স্ববিরোধী অবস্থানে আছেন। তাদের এই চিন্তা-গবেষণার দৃষ্টান্ত যেমন তাদের সৃষ্ট একটি বৃত্তাকার দুর্ভেদ্য আকাশছোঁয়া দেওয়াল [circular wall]। এর কেন্দ্রে [centre] অবস্থান করে সত্য! এই সত্যকেই খুঁজছেন মহাচিন্তাবিদরা। বৃত্তসদৃশ এ দেওয়ালের পরিধিরেখা [circumference] হলো তাদের সন্দেহবাদ বা অবিশ্বাস [scepticism or infidelity]। এটা অতিক্রম করা ছাড়া সত্যের কাছেও যাওয়া যাবে না। সুতরাং তারা তারই খুঁজে দেওয়ালের চতুর্দিকে ঘুরছেন অনবরত। তারা যে ঘুরছেন তা কিন্তু নিজেরাও ওয়াকিফহাল নন! দুর্ভেদ্য এ দেওয়ালের অভ্যন্তরে প্রবেশের একমাত্র উপায় হলো 'বিশ্বাস' বা ঈমান। কুরআনের ভাষায়, "আল্লাজিনা ই'মিনূনা বিল গ্বাইবি" - যারা গ্বায়েবে [অদৃশ্যে] বিশ্বাস করে।

উপরের এ্যানালজি দ্বারা এটাই প্রমাণ হলো "ঈমান" হলো প্রভুকে জানার পূর্বশর্ত। ঈমান নাই- আপনার নিকট প্রভুও নাই। কারণ "ঈমান নাই" থাকার অর্থই এটা। আর বিপরীত কথা অর্থাৎ "ঈমান আছে"- মানে আপনার নিকট প্রভুও আছেন। কারণ, "ঈমান থাকার" অর্থই এটা। সুতরাং যারা স্কেপটিক, সন্দেহবাদী, অবিশ্বাসী- তারা যতো গবেষণাই করুন না কেন, যতো বড় প্রজ্ঞাবান হিসাবে নিজেকে মনে করুন না কেন, কিংবা তিনি যতো বড়ো দার্শনিক বা বিজ্ঞানী হোন না কেন, প্রভুবিশ্বাসের ক্ষেত্রে তিনি তো মূল থেকেই অন্ধ! তিনি কিভাবে প্রভুর অস্তিত্ব প্রমাণ করবেন? তাঁর অন্তরে তো সেটা উপলব্ধির ক্ষমতাই অনুপস্থিত! কুরআনের

ভাষায় তারা হলেন, "খাতামাল্লাহু আলা কুলুবিহিম" - তাদের অন্তর মোহরাঙ্কিত। তবে এটা ভাবতে নেই, কেউ বিজ্ঞানী বা দার্শনিক হলেই তিনি প্রভুবিশ্বাসী হবেন না- বা হতে পারেন না। না, না- এটা মোটেই সত্য নয়। অনেক বিজ্ঞানী ও দার্শনিক ছিলেন এবং আছেন যারা আল্লাহর প্রিয়জন হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।

আমার অনুরোধঃ নিম্নোক্ত পশ্চিমা ধর্মদর্শন এখানে উপস্থাপনের উদ্দেশ্য আমি পরিষ্কার করেছিঃ এ বিষয়ে কিছু গুণিজনের ভ্রান্তি অনুধাবন। তবে অপরিপক্ক মনের অধিকারী আমরা অনেকেই। আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিপূর্ণ সুন্দর সুন্দর কথা দ্বারা হয়তো আমরা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়তে পারি। তাই নিম্নোক্ত কয়েকটি পয়েন্ট অন্তরে ভালোভাবে নিবদ্ধ রেখে বাকী পৃষ্ঠাগুলো- বা এমনকি উপরের পশ্চিমা দর্শনের বিভিন্ন দিকের আলোচনা পাঠ করা উচিৎ।

১. প্রভুবিশ্বাসের উপর কোন কন্ক্লুশন বা শেষ ধারণা (উপসংহার) আমরা গ্রহণ করবো না। এর কারণ হলো, দার্শনিকদের এসব কথা ফাইনেল নয়।

২. আমাদের ঈমান ও আমলের সঙ্গে সংঘাতময় কোন উক্তি আমরা গ্রহণ করবো না। এ ক্ষেত্রে গবেষকের "**সন্দেহবাদ**" ও "**নাস্তিক্যবাদ**" ক্রিয়া করেছে বলেই তা অগ্রহণযোগ্য।

৩. ধর্ম নিয়ে তাদের যে কোন উক্তি বা আত্মবিশ্বাস আমরা বিনা প্রশ্নে মেনে নেবো না। হতে পারে তা তাদের নফসের আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কিংবা সূক্ষ্ণ কোনো "ঈমান বিধ্বংসী" কারসাজি। মোটকথা, ধর্মনিয়ে তাদের দার্শনিক চিন্তাধারার স্বরূপ কি তা জানা ও নিজেদেরকে এর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা এবং স্বীয় ধর্মবিশ্বাসের উপর আরো অটল ও

দৃঢ়তা অর্জনের লক্ষ্যেই এ লেখা আমরা পাঠ করছি এবং গবেষক হিসাবে এ নিয়ে গবেষণা করেছি। আধুনিক যুগে তথ্যবিপ্লবের সুবাদে অনেক কাণ্ডজ্ঞানহীন 'উদ্ভট আইডিয়া থেকে ডাহা মিথ্যা ও আমাদের প্রাণের ঈমানবিরোধী কথাবার্তা' পুরো বিশ্বব্যাপী প্রচার হচ্ছে বিজ্ঞান ও দর্শনের নামে। আমরা এ থেকে কিভাবে রক্ষা পাই- সে চিন্তা থেকেই গবেষণার এ প্রয়াস।

৪. পশ্চিমা দার্শনিকদের প্রায় সকলেই ইয়াহুদী-খ্রিস্টবাদী ধর্ম ছাড়া অন্যান্য ধর্ম যেমন ইসলাম, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ইত্যাদি প্রাচ্যে আবির্ভূত-হওয়া ধর্ম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখেন বলে আমরা মনে করি না। সুতরাং তাদের এসব ধর্ম সম্পর্কে কোনো উক্তি বা কটুক্তির প্রতি আমারা তোয়াক্কাই করবো না। কারণ, আমরা মনে করি, যে কোন ধর্মবিশ্বাসের গভীর মর্মোদ্ধার সে ধর্মের অভ্যন্তরে থেকে তথা এ ধর্মের বিশ্বাসী হয়ে এবং তার নিয়মকানুন, আমল-ঈমান কায়মনোবাক্যে নির্ধিদ্বায় মান্য করে উচ্চ পর্যায়ের গবেষণা সম্ভব। সুতরাং অপর্যাপ্ত জ্ঞান নিয়ে ধর্মগবেষণা করার চেষ্টা, মূলত বিভ্রান্তি ও সময় সময় ভীষণ ক্ষতিকর হতে পারে পুরো সমাজের জন্য। আমরা এরূপ হওয়াকে কখনো সমর্থন করতে পরি না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যদি বলিঃ নিজেদেরকে 'মুক্তমনা', 'চরম যুক্তিবাদী', 'সন্দেহবাদী', 'লজিশিয়ান' ইত্যাদি হিসাবে গর্বভরে পরিচয়দান করেও যদি কেউ বলে অমুক ধর্মের অমুক বিশ্বাস ভ্রান্ত, তাহলে তা কোন্ যুক্তিতে মানা যায়? এ ধর্মনিয়ে গবেষণাও তার জন্য অবৈধ! কারণ তিনি ঐ ধর্মে বিশ্বাসীই নন। এরূপ ব্যক্তি থেকে উক্তরূপ বৈরিভাবাপন্ন মন্তব্য বা গবেষণার ফলাফল ছাড়া আর কি আশা করা যায়? মোটকথা, আমরা নিজেদের ধর্মবিশ্বাস ও ঈমান-আক্বীদার সঙ্গে তুলনা করে কখনো অবিশ্বাসী ভিন্নধর্মী কারো বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক গবেষণার ফলাফল যাচাই করবো না।

আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে এই কামনা করছি যে, উপরোক্ত কথাগুলো মনে রেখে আপনারা পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলো পাঠ করবেন। দর্শনের এই গবেষণা দ্বারা পাঠকদের কতটুকু উপকার হবে তা জানি না- কিন্তু আল্লাহ না করুন, এক রতিও অপকার হোক তা আমি কষ্মিনকালেও কল্পনা করবো না। আমরা প্রভুর আশ্রয়প্রার্থী।

এবার, নিম্নে অতি সংক্ষেপে দর্শন ও [ইয়াহুদী-খ্রিস্টবাদী] ধর্মের উপর আলোচনা তুলে ধরেছি। আমার বিশ্বাস পাঠকরা এ থেকেই ধর্মের প্রতি দার্শনিকদের আস্থা কতটুকু তা বুঝে নিতে পারবেন। একটি কথা জানিয়ে দিতে চাচ্ছি, তাহলো এই গ্রন্থের প্রায় সব কথাই মূলত পশ্চিমা দর্শনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের উক্তি ও গবেষণা- যা আমি বাংলা ভাষায় ব্যক্ত করেছি। যেখানে নিজের মতামত দিয়েছি তা স্পষ্ট উল্লেখও করেছি। সুতরাং ধর্মদর্শনের উপর সকল কথাই 'তাদের' [মানে পশ্চিমা দর্শন ও এ নিয়ে গবেষকদের], আমার নয়। যেখানে আমার কথা থাকবে, সেখানে উল্লেখ করবো।

৫.ক. বাইবেল-নির্ভর ডিজাইন আর্গুমেন্ট [design argument]ঃ ক্লিনথেস নামক এক ব্যক্তি 'গডের' অস্তিত্ব প্রমাণ করতে কিছু বক্তব্য প্রধান করেন ঈসায়ী অষ্টাদশ শতাব্দিতে। পরবর্তীতে এটা **'ডিজাইন আর্গুমেন্ট'** নামে খ্যাত হয়। কিন্তু ১৭৭৯ সালে ডেভিড হিউম এর জবাবে 'Dialogue Concerning Natural Religion' গ্রন্থে যা বলেছিলেন তা হলোঃ "Look round the world: contemplate the whole and every part of it. You will find it to be nothing but one great machine, sudivided into an infinite number of lesser machines, which again admit of subdivisions to a degree beyond what human senses and faculties can trace and explain. All these

various machines, and even their most minute parts, are adjusted to each other with an accuracy which ravishes into admiration all men who have ever contemplated them. The curious adapting of means to ends, throughout all nature, resembles exactly, though it much exceeds, the production of human contrivance; of human designs, thought, wisdom, and intelligence ... Since, therefore, the effects resemble each other, we are led to infer, by all the rules of analogy, that the causes also resemble; and that the Author of Nature is somewhat sismilar to the mind of man, though possessed of much larger faculties, proportioned to the grandeur of the work which he has executed. By this argument a posteriori, and by this argument alone, do we prove at once the exitence of a Deity, and his sismilarity to human mind and intelligence."

উপরের কিছুটা কৌশলগত লেখা দ্বারা হিউমের উদ্দেশ্য ছিলো "ডিজাইন আর্গুমেন্টকে" ঘুষি মেরে ফেলে দেওয়ার নিমিত্তে নিজের আর্গুমেন্ট তৈরীর প্রস্তুতিগ্রহণ। তা তিনি ঠিকই করেছিলেন। 'গডে' অবিশ্বাসী ও সন্দেহবাদীদের দৃষ্টিতে একেবারে 'demolition job'। এটুকু মন্তব্য প্রদানের পরও পশ্চিমা দার্শনিকরা আবার বলেন, তবে এটা একটি আশ্চর্যের ব্যাপার যে, ডিজাইন আর্গুমেন্ট [অর্থাৎ স্বভাবকে কেউ ডিজাইন করেছেন] এখনও সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। বার বার সে আত্মপ্রকাশ করে। অবশ্য এর সংস্কার হয়েছে একাধিকবার। ডিজাইন

আর্গুমেন্ট খুব প্রভাবশীল ছিলো ঈসায়ী অষ্টাদশ শতকে। তবে এর সূত্রপাত কিন্তু প্রাচীনকালে ঘটে।

ডিজাইন আর্গুমেন্ট কিভাবে কাজ করেঃ এই আর্গুমেন্টের মূল শক্তি স্বভাবে দৃশ্যমান সৌন্দর্য, সামঞ্জস্যশীলতা, জটিলতা এবং দৃশ্যতঃ উদ্দেশ্যে সম্পর্কে চিন্তাশীল মানুষের মধ্যে যে শক্তিশালী ধারণার জন্ম নেয় তার উপর নির্ভরশীল। এটা কিভাবে মন-হীন, উদ্দেশ্যহীন, নেচারেল প্রসেস হতে পারে? এটা মনে করা হয়, এর পেছনে কোন অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা জড়িত আছে। এই অসম্ভবভাবে জটিল-কঠিন কাজ সমাধা করতে প্রয়োজন হয় বিরাট দক্ষতা ও পরিকল্পনার। এতো সূক্ষ্ম ও দক্ষতার সাথে স্বভাবের প্রতিটি জিনিস ডিজাইন করা হয়েছে, যা আমাদেরকে ভাবিয়ে তুলে। যেমন মানব চক্ষু, এতো সুন্দরভাবে এটা তৈরী করে সঠিকভাবে স্থাপন করা হয়েছে, তার প্রয়োজন মেটাতে। সুতরাং এটাকে নিশ্চয়ই 'ডিজাইন করা হয়েছে' উদ্দেশ্য হাসিলে।

উপরোক্ত কথাগুলো দ্বারা যে কোন ব্যক্তি প্রভাবিত হবে নিঃসন্দেহে। এরপর আরো বলা হয়, একটি ঘড়ির কথা ভাবুন। এটা এতো সুকৌশলে ডিজাইন করা হয়েছে একটি বিশেষ কাজ সমাধার লক্ষ্যে। এ থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি, নিশ্চয় এটা সৃষ্টির পেছনে একজন প্রস্তুতকারক আছে। সুতরাং এরূপ অগণিত বস্তু থেকে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, প্রতিটি জিনিসই কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে বানানো হয়েছে। আর এসব বস্তুর একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। অর্থাৎ একজন ডিজাইনার অবশ্য থাকবেন। এমন এক স্থপতি যাঁর দ্বারা পরিকলল্পিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে বিশ্বব্যাপী স্বভাবের অসংখ্য চিত্তাকর্ষক বস্তু। এরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রস্তুতকারক একমাত্র একজন হতেন পারেনঃ তিনি হচ্ছে 'গড'।

সন্দেহবাদীদের জবাবঃ ডিজাইনে ফাঁটলসমূহঃ এসব কথার মধ্যে বিরাট প্রভাব থাকলেও কিছু সিরিয়াস অভিযোগ তোলা হয়েছে ডিজাইন আর্গুমেন্টের বিরুদ্ধে। এসব অভিযোগের প্রবক্তা ছিলেন হিউম ও অন্যান্য দার্শনিক। আর নিম্নোক্ত পয়েন্টগুলো সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ক্ষতিকারক।

১. উপরে চোখ ও মনে করুন ক্যামেরার সঙ্গে তুলনা করে আর্গুমেন্ট তৈরীর চেষ্টা হয়েছে। মানব সৃষ্ট প্রযুক্তি এবং নেচার সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে তুলনা মূলত যৌক্তিক নয়। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ধরনের তুলনা হয় না। সুতরাং এভাবে কৃত্রিম ও অকৃত্রিম দু'টি বস্তুর দ্বারা এ্যানালজি খুব দুর্বল। [**আমার কথাঃ** মোটেই নয়। শুধু ক্যামেরা কেনো, যাবতীয় প্রযুক্তির মূলে যে জিনিসটি সক্রিয় তাহলো নেচারেল ডিজাইন! স্বভাবে প্রাপ্ত মৌলিক কলা-কৌশলের অনুসরণে বা বলতে পারি কৌশলে এগুলোর মধ্যে রদবদল এনেই মানুষ সৃষ্টি করছে নতুন নতুন বস্তু। এনার্জি রূপান্তরের মাধ্যমে মেকানিকেল 'কাজ' [ওয়ার্ক] সমাধা হয়। আমরা যেভাবে কানে শুনি তার সঙ্গে তুলনীয় মাইক্রফোন ও স্পিকার সিস্টেম। স্বভাবের চিত্তাকর্ষক ডিজাইন প্রতিনিয়ত আমাদের সম্মুখে উন্মোচন হচ্ছে- তা-ই আমরা প্রযুক্তির মাধ্যমে এগুলো কাজে লাগাচ্ছি। সুতরাং নেচারেল বস্তু ও মানবসৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক নেই বা তুল্য নয় তা বলা উদ্ভট ও যুক্তিহীন।]

২. ডারউইনের বিবর্তনবাদ দ্বারা বুঝানো যায় কিভাবে প্রাণীদের ক্রমবিবর্তন ঘটেছে কোটি কোটি বছরে নেচারেল সিলেকশনের মাধ্যমে। এই থিওরীতে কোন ডিজাইনারের প্রয়োজন হয় না। [**আমার কথাঃ** এখানে উল্লেখ্য কেউ এখনো সুস্পষ্ট প্রমাণ খাড়া করতে পারেন নি, 'ধারণাসর্বস্ব' বিবর্তনবাদ আসল সত্য কি না। অথচ নাস্তিক্যবাদী দার্শনিক ও কিছু বিজ্ঞানীও একে 'বৈজ্ঞানিক সত্য' বলে সাফাই গাচ্ছেন। মানব কোষের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মলিকিউলের নাম ডিএনএ। জটিলতা, কাঠিন্যতা, সৃষ্টিশীলতা, ডিজাইন যাই বলুন না কেন এরূপ সৃষ্টি এমনিতেই 'নেচারেল

সিলেকশনের' মাধ্যমে হয়েছে তা বিশ্বাস করা কঠিন। বিংশ শতকের শেষের দিকে হিউমেন জিনোম প্রজেক্টের মাধ্যমে ডিএনএ কোড সনাক্ত করা হয়েছে। প্রজেক্টের একজন বিজ্ঞানী ডিএনএ'র এরূপ নিপুণ কলাকৌশল লক্ষ্য করে মন্তব্য করেছেন: জগৎসৃষ্টির শুরু থেকেও নেচারেল সিলেকশন ডিএনএ তৈরীর কাজে লেগে থাকলেও অনুরূপ ডিএনএ মলিকিউল 'এমনিতে' সৃষ্টি করার কোন উপায় আমি দেখছি না। কারণ নেচারেল সিলেকশনের আইন মুতাবিক এরূপ একটি বস্তু এমনিতেই তৈরী হতে ১৪ বিলিয়ন বছরও যথেষ্ট বলে মনে করি না। অথচ একটি মাত্র ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ডিএন'র মধ্যে মানবদেহের যাবতীয় কোড সংরক্ষিত আছে! সুতরাং ডিএনএ'র ওয়ান্ডার দেখে বিজ্ঞানী হয়েও আমি বলতে বাধ্য- এটি কেউ ডিজাইন করেছেন স্বেচ্ছায়- আর ইনি 'গড' ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না।]

৩. [**আমার কথা:** আরো কিছু উদ্ভট যুক্তি!] তাদের কথা: যদিও আমরা ডিজাইনকে মেনে নিই এরপরও প্রশ্ন থেকে যায়, কতটুকু আমরা মেনে নিতে পারি? স্বভাবের অসংখ্য 'কলা-কৌশল' দ্বারা এটাই অনুমেয়, একটি ডিজাইন কমিটি থাকতে হবে! সুতরাং আমাদেরকে 'গডদের' একটি টীমের প্রয়োজন। সুতরাং অবশ্যই আমাদেরকে শুধুমাত্র 'এক জনের' মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা চলবে না। নেচারেল প্রায় সকল বস্তু যতোই আশ্চর্যজনক মনে হোক না কেন, আসলে সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে তৈরী নয়: সুতরাং 'ভুলমিশ্রিত' ডিজাইন থেকে এটাই কি প্রমাণিত হয় না যে ঐ ডিজাইনার ভুলের? সাধারণত, জগতে যতো খারাপ জিনিস আছে তা থেকে এসবের সৃষ্টিকর্তার নীতি-নৈতিকতার উপর সন্দেহ হয়। আর অবশ্যই ঐ ডিজাইনার যতো সুন্দরভাবে ডিজাইন করে থানুন না কেন, তিনি [এখানে একজন লেখক গডকে নারী মনে করে, ইংরেজি she শব্দটি ব্যবহার করেছেন।] এখনো জীবিত আছেন বলে কোনো সুস্পষ্ট 'যুক্তি' নেই।

[**আমার কথা:** এখানকার অযৌক্তিক মনগড়া মাম্বুল-জাম্বুল ধরনের লেখা থেকে স্পষ্ট, লেখক সম্পূর্ণরূপে এক নাস্তিক বৈ নন। কারণ তিনি মনে করেন, সমগ্র সৃষ্টির অসংখ্য বস্তু ডিজাইন করতে নাকি একদল গডের প্রয়োজন! কী অদ্ভুট, বানোয়াট, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মনগড়া উক্তি এটি? তিনি অবিশ্বাসী হওয়ায় গডের ক্ষমতাকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করার কথা বলেছেন! আশ্চর্য, এরূপ স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ 'দার্শনিক হওয়ার' দাবী করেন? নেচারে তিনি ভুল-ত্রুটি বের করেছেন। তা হতে পারে, এতে ডিজাইনারের কীর্তির প্রমাণ বহন করে- কোন ভুল নয়। ডিজাইনার চেয়েছেন এভাবে সৃষ্টি করতে যাতে তাদের মতো পরকাল-অবিশ্বাসী দার্শনিকরা চিরদিন জীবিত না থাকেন! অবশ্য এটা তো তারা সর্বদাই আশা করেন। বাস্তবে নেচারে যেসব কথিত 'ভুল' তিনি দেখেছেন তা তাদের মতো স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন চরম যুক্তিবাদী অন্ধ-বিশ্বাসীদের মনে কোঠারাঘাত করতেই গড এরূপ ডিজাইন করেছেন। তিনি জগতে খারাপ জিনিসসমূহ দেখেছেন। ভালো কথা, খারাপ থেকে নিজেকে বাঁচান, ঈমান আনুন, পরকালে পাবেন অশেষ সুখের উদ্যানসমূহ- নিষ্কলুষ, নির্ভেজাল, চিরস্থায়ী। আপনারা কি আশা করছেন? এ জগতকে কেনো গড প্যারাডাইজ বানালেন না? আর আপনারা যেখানে-সেখানে বসে শুধু আনন্দ-ফুর্তি করতেন, তাই না? ডিজাইনার এ জগতে এসে আনন্দ-ফুর্তিতে মেতে ওঠার জন্য কাউকে বানান নি- বানিয়েছেন তাঁর উপাসনার জন্য। ও হ্যাঁ, আপনাদের মতো চিন্তাশীলরা তা বুঝবেন কিভাবে? খাও-দাও-ফুর্তি করো- এটাই আপনাদের উদ্দেশ্য। পরকাল নেই। বেহেশত নেই। হায় হায়, কি হতাশা!]

চিন্তাখাদ্য: আপনি কী মনে করেন, দার্শনিকরা কি ধর্মদর্শনে একেবারে স্থূলবুদ্ধির পরিচয় দেন নি?

[**আমার কথা:** এদের ধর্মদর্শন নিয়ে সংলাপ আরো কিছু শোনতে আপনাদের ভালো লাগছে? আমার লাগছে না। দু'টি [পশ্চিমা] ধর্মসমর্থক আর্গুমেন্ট নিয়ে আলোচনা শেষেই ইতি টানছি। যা আমি ধারণা করেছিলাম, এ পর্যন্ত গবেষণায় তা-ই আমার নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে: যে ধর্মবিশ্বাসের উপর পশ্চিমা দার্শনিকরা তামাশার সুরে সবকিছু খণ্ডন করেছেন বা করছেন বিনা দ্বিধায় তার মূল কারণ, ঐ 'ধর্মবিশ্বাসে' গণ্ডগোল থাকা। মানবসৃষ্ট উপাদান অবাদে তাদের ঐশীসূত্রে সংমিশ্রণের ফলে আজ দার্শনিক ও কিছু বিজ্ঞানীর জন্য তারা 'লাফিং স্টকে' পরিণত হয়েছেন। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চরম যুক্তিবাদী দর্শনের হামলায় ধর্মবিশ্বাসী চিন্তাশীলরা এখন হিমশিম খাচ্ছেন: যেন আত্মসমর্পণ ছাড়া উপায় নেই! ভাগ্যিস! আমার ধর্মবিশ্বাস 'সম্পূর্ণটাই' নিষ্কলুষ ঐশীজ্ঞানের উপর ভিত্তিশীল। আমার ধর্মবিশ্বাসের উপর আঘাত হানা 'একমাত্র মাম্বুল-জাম্বুল বক্তব্য' ছাড়া সুচিন্তিত সত্যিকার যুক্তিনির্ভর উপায়ে কারো পক্ষে সম্ভব নয়- কখানো নয়। দেশীয় কিছু তথাকথিত পশ্চিমাবাদী চিন্তাবিদরা নাস্তিক্যবাদের গোলকধাঁধাঁয় পড়ে অন্ধ হয়ে, তাদের পশ্চিমা কলিগদের মতোই কথা বলেন। যুক্তি খাড়া করেন। কিন্তু তারা ব্যর্থ হবেন- হয়ে আসছেন ১৫ শত বছর যাবৎ।]

৫. খ. পুরাতন/নতুন বাইবেল নির্ভর কজমোলজিকেল আর্গুমেন্ট [cosmological argument]: এই আর্গুমেন্ট অতি সরল: প্রশ্ন: কোনো কিছু না হয়ে কোন্ কারণে কোনো কিছু আছে? উত্তর: গড। [**আমার কথা:** এখানে এটাই বলা হচ্ছে সৃষ্ট জগৎ থাকায় প্রমাণ করে এর একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। এটাকে কজমোলজিকেল এজন্য বলা হয়- সৃষ্টিতত্ত্ববিদরা আজো এটা তাত্ত্বিকভাবে [তা দার্শনিক কিংবা বৈজ্ঞানিকই হোক] প্রমাণ করতে পারেন নি, জগৎসৃষ্টির কারণ কি? এই আর্গুমেন্ট শক্তিশালী বটে, কিন্তু এর উপর পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা না থাকায় বা অত্যল্প হওয়ায় বিরোধীরা খুব সহজে এর উপর হামলা চালাতে সক্ষম হচ্ছেন। এটা পুনরায় বলতেই হয়, যে [দ্বিত্ববাদী এবং ত্রিত্ববাদী] ধর্মবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে তারা এই আর্গুমেন্ট উপস্থাপন করেছিলেন সেটির মধ্যে মৌলিক দুর্বলতা থাকাই দায়ী। থমাস একুইনাসকে এই আর্গুমেন্ট উত্থাপনের জন্য দায়ী করা হয়। কিন্তু বাস্তবে এর অস্তিত্ব তার অনেক অনেক আগে থেকেই খুঁজে পাওয়া যায়। ইমাম গাযযালী [মৃ. ঈসায়ী ১১১১] যিনি একুইনাসের বেশ পূর্বে পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন, এই আর্গুমেন্ট তুলে ধরেছেন। যাক এরপরও মনে হয় এই আর্গুমেন্টটাই সর্বাপেক্ষা মৌলিক। এর জবাব আসলে দর্শন ও বিজ্ঞানের নিকট নেই। আমরা একটু পরই নাস্তিক্যবাদী দার্শনিক বেট্রান্ড রাসেলের আত্মসমর্থনমূলক একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরবো। এ থেকেই ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে।]

উক্ত প্রশ্নের উত্তর দ্বারা সৃষ্টির মূল কারণ ‘গড’ বুঝাচ্ছে। এটা কার্য-কারণ নীতির চূড়ান্ত পর্যায়। দৃশ্যত জগতের সব ক্রিয়া কোনো কারণে ঘটে থাকে। এভাবে কয়েকটি কারণ খুঁজে বের করার পর আমরা সর্বশেষ কারণে পৌঁছে যাই- তখন বাধ্য হয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে ‘গড’-কে ছাড়া

কারণের কারণ আর কিছু বা কাউকে পাই না। এই আর্গুমেন্ট অত্যন্ত শক্তিশালী।

কেনো 'কোন কিছু নাই' নয়ঃ কজমোলজিকেল আর্গুমেন্টের মূল্যের উপর গবেষণা এই মুহূর্তে একটু একপাশে রেখে, এটা মেনে নিতে হবে যে, এই আর্গুমেন্টটির উৎপত্তি সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক, মৌলিক এবং গভীরতম একটি প্রশ্ন থেকে যা আমরা জিজ্ঞেস করতে পারিঃ কেনো যে কোন কিছুই অস্তিত্বশীল আছে? কোন কিছুই না-ও থাকতে পারতো-কিন্তু এখানে আছে। কেনো? 'গডের' অস্তিত্বের পক্ষে অপর ক্লাসিক আর্গুমেন্টের [ইতোমধ্যে আলোচিত ও দার্শনিকদের কর্তৃক কটাক্ষের শিকার 'ডিজাইন আর্গুমেন্ট' এখানে উদ্দেশ্য] মতো, কজমোলজিকেল আর্গুমেন্টের মূলও সুদূর অতীতে। গডের অস্তিত্বের প্রমাণ হিসাবে থমাস একুইনাসের মোট পাঁচটির [Quinque Viae - পাঁচ পথ] মধ্যে এটাই ছিলো প্রথম আর্গুমেন্ট। আধুনিক কোন বৈজ্ঞানিক কজমোলজিস্টকে এই প্রশ্ন করলে, "কেনো কোনো কিছু অস্তিত্বশীল আছে?" নিঃসন্দেহে উত্তর দেবেন, 'বিগ বেং' [Big Bang - মহাবিস্ফোরণ থিওরী] এর কারণে। এই থিওরী বলে, আজ থেকে ১৩-১৪ বিলিয়ন বছর পূর্বে এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে পুরো মহাবিশ্ব, এনার্জি এবং স্বয়ং সময়ও আস্তিত্বে আসে। তবে এ উত্তর তো যথেষ্ট নয়। এ থেকে আমরা পুরোদমে হতাশমুক্ত হতে পারছি না। এর দ্বারা মূল প্রশ্নটির শুধু সামান্য সংস্কারের প্রয়োজন দাঁড়ায়ঃ "কী বা কে বিগ বেং ঘটালো?"

দার্শনিকদের সন্দেহঃ [আমার কথাঃ চরম সন্দেহবাদের অন্ধত্বে এবং হৃদয়ে 'ঈমানী নূরের" অভাবে পুনরায় সন্দেহবাদী ও নস্তিক দার্শনিকরা কজমোলজিকেল আর্গুমেন্টের জবাবঃ 'গড' সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তার উপর পাল্টা আর্গুমেন্ট তৈরী করে আক্রমণ করে থাকেন। এখানেও দার্শনিকদের 'একগুয়েমীর কট্টরতা' দেখে আমি অবাক! ঈমানী নূরের

অভাবে যে কোনো মানুষ- তা তিনি যতো বড় গবেষক বা চিন্তাশীল হোন না কেন, সত্য থেকে দূরে থাকতে বাধ্য। এটা ঠিক তার নিজের বুঝের অভবে নয়- বরং ঈমান থেকে বঞ্চিত থাকার দুর্ভাগ্য এর মূল কারণ।] কজমোলজিকেল আর্গুমেন্টের আকর্ষণ একটি আকর্ষণীয় প্রশ্নের মধ্যে নিহিত। অন্ততঃ মনে হয়, এটি একটি আকর্ষণীয় প্রশ্ন, আর নিঃসন্দেহে এটা স্বাভাবিক প্রশ্ন তো বটেই: আমরা কেনো (এবং বাকী সমগ্র মহাবিশ্ব) অস্তিত্বশীল? কজমোলজিকেল আর্গুমেন্ট এ প্রশ্নের ভালো জবাব দিচ্ছে কি? একে সন্দেহ করার বেশ ক'টি কারণ আছে!

১. নির্ভেজাল সদৃশ কজমোলজিকেল আর্গুমেন্টের মূল প্রেমিজ, তথা 'সবকিছু হওয়ার কারণ অন্য কোনো কারণ' [যাকে কার্যকারণ নীতি বলে] মূলত পৃথিবী (এবং মহাবিশ্বে) বস্তুসমগ্র কিভাবে আছে সে সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আর্গুমেন্ট আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে এ অভিজ্ঞতাকে বর্ধিত করা এমন এক বিষয়ের প্রতি, যা মৌলিকভাবে আমাদের অভিজ্ঞতার 'বাইরে' অবস্থান করে। কারণ যা থেকেই এ বিশ্বজগৎ অস্তিত্বশীল হোক না কেনো, তা এ বিশ্বজগতের বাইরের ব্যাপার। অবশ্যই আমাদের অভিজ্ঞতা ওসব জিনিসের উপর কেনো আলোকবর্তিকা প্রসার করতে অপারগ, এবং এটা অনুমেয় নয় যে, মূল ধারণাটি যৌক্তিক নয়: মহাজগতের অর্থ যা কিছু এর মধ্যে অস্তিত্বশীল আছে তা-ই, আর এর শুরু থেকে (যদি তার কোনো শুরু হয়েই থাকে) সময়েরও শুরু। **[আমার কথা:** এই পয়েন্টটি সে-ই কোনো কোনো বিজ্ঞানীদের কর্তৃক একই প্রশ্ন এড়ানোর উত্তরের মতো: সময় যখন শুরুই হয় নি- তাহলে 'সে কালে কি হয়েছিল?' এ প্রশ্ন মূলত অযৌক্তিক। বাস্তবে, কজমোলজিকেল প্রশ্নের সঠিক উত্তর দর্শন বা বিজ্ঞান দ্বারা আদৌ সম্ভব নয়- যতক্ষণ না উভয় বিষয়ের গবেষকদের মধ্যে একটি ব্যাপারে বোধোদয় না হবে- তাহলো, নিজেরা তারা গডের অস্তিত্ব মানেন বা না- এটা অন্তত স্বীকার করে নেওয়া যে, জগৎসৃষ্টির মূল কারণ আমরা

জানি না- তাই, হয়তো সর্বক্ষমতাসম্পন্ন কেউ এসব সৃষ্টির কারণ হতে পারেন। কারণ, ভাষা ও [তাদেরই গবেষণা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ফাঁটলযুক্ত] লজিক বা যুক্তিবিদ্যা দ্বারা কি করে তারা প্রমাণ করবেন, জগৎসৃষ্টির কারণ কেউ নন- যেখানে পুরো বিজ্ঞান ও দর্শনের মূল হলো কার্যকারণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত? বাস্তবে কজমোলজিকেল আর্গুমেন্টের সঠিক জবাব তাদের নিকট নেই! হয়তো তাদেরকে মানতে হবে 'গড' আছেন, না হয় পুরো আর্গুমেন্টটা তাদের 'দুর্বল প্রেমিজের উপর নির্ভরশীল লজিক ও ভাষার মারপ্যাঁচে'র আশ্রয় নিতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত (পুনরায় বলছি, হৃদয়ে ঈমানী নূরের অভাবে) তারা বেছে নিয়েছেন শেষোক্তটি। এবার দেখা যাক- সত্যকে অস্বীকার করার আর কী আছে তাদের আস্তিনে?]

২. আর্গুমেন্টের মূল প্রেমিজ (অর্থাৎ সবকিছুর পেছনে কারণ আছে) এর কন্ক্লুশন (শেষ কথা) স্ববিরোধী। কারণ, গড থাকারও আরেক কারণ থাকতে হবে। [**আবারো আমার কথা:** এখানে আমি আশ্চর্যবোধ করছি, বড় বড় চিন্তাশীল দার্শনিকরা এরূপ যুক্তি খাড়া করছেন দেখে। মূলত, তারা গডের বা একজন সর্বশক্তিমান প্রভুর গুণাবলীকেও মানবিক (বা সৃষ্টির) দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রয়াস পাচ্ছেন! এ সাধারণ কথাটি তাদের অন্তরে ঢুকছে না যে, গড বা লর্ড [প্রভু] সৃষ্টির সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল নন, তিনি একক ও একক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সুতরাং কোন্ যুক্তিতে তারা তাঁকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করেন?] সুতরাং এ সমস্যা দূর হবে যদি 'গড' সবকিছুর ব্যাপ্তির বাইরে কোথাও অবস্থান করেন। আর সবকিছুর ব্যাপ্তি মানে 'স্বভাবের সবকিছু'। অন্য কথায় 'গড' নেচারেল নন, বরং সুপারনেচারেল [অতিস্বাভাবিক]। এটা হয়তো তাদের জন্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে যারা কজমোলজিকেল আর্গুমেন্টের ফলাফল [অর্থাৎ সকল কারণের কারণ গড] এতে বিশ্বাসী। কিন্তু অন্যদের জন্য, যারা স্বতঃস্ফূর্ত প্রমাণ চান, এটা শুধুমাত্র রহস্যে অতিরিক্ত উপাদান যোগান দিচ্ছে মাত্র। এতে তাদের মধ্যে সন্দেহের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পায় যে, এই আর্গুমেন্টের

ভিত্তি মৌলিকভাবেই যুক্তিহীন বা লজিকবিরোধী কিংবা বুদ্ধিসম্পন্ন নয়। [**আমার কথা:** এখানে সন্দেহবাদ ও ঈমানহীনতার কুফল উন্মুক্ত হয়েছে। এবারও বলতে হচ্ছে, কোনো জিনিস থাকতে পারে- তার উপর বিশ্বাস না থাকলে ঐ জিনিসের প্রমাণ চাওয়া যে যুক্তিহীন বা লজিকবিরোধী- এ সরল কথাটি চিন্তাশীলদের মাথায় ঢুকছে না। অন্যথায় সুপারনেচালের [অতিস্বাভাবিক] গড থাকার সম্ভাবনা উল্লেখ করেও তারা কোন্ কারণে আবার সন্দেহ করছেন? মূলত, যারা ঈমান আনবে না তাদের যুক্তিতর্ক এরূপই হয়ে থাকে।]

৩. এই আর্গুমেন্ট নির্ভরশীল এ ধারণার উপর: অসীম কার্যকারণ রিগ্রেশন [regression] আমাদের জন্য অস্বস্থিকর: চেইন কোথাও শেষ হওয়া চাই। এবং এই 'কোথাও' হচ্ছেন গড। তিনি অ-কারণযুক্ত [বা স্ব-কারণযুক্ত]। তাঁর কারণ তিনিই। কিন্তু অসীম চেইনের ধারণা, যার অর্থ মহাবিশ্বের কোনো শুরু ছিলো না- বাস্তবিকই সময়ের বাইরে থাকা সুপারনেচারেল কিছু একটা থাকার ধারণা থেকে অতিরিক্ত অস্বস্থিকর? [**আমার কথা:** এখানে ডিগবাজী খাচ্ছেন, সন্দেহবাদীরা। বিজ্ঞান আজ যে থিওরীর উপর সম্পূর্ণরূপে আস্থাশীল [আর ভবিষ্যতে না থাকলেও কিছু যায় আসে না- কারণ আজ থেকে হাজার বছর পরও আজকের বৈজ্ঞানিক অনেক যুক্তিনির্ভর থিওরীও হয়তো বদলে যাবে- সেসাথে দর্শনও, সন্দেহ নাই। উভয় বিষয়ের অতীত ইতিহাস সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে এ কথাটির।] এখানে আর্গুমেন্টে উল্লেখিত অসীম চেইনের ধারণা মানলে দার্শনিকদের বাধ্য হয়ে 'গডকে' বিশ্বাস করতে হবে- যুক্তিরই মানদণ্ডে। তাই এ থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে গিয়ে আরেক যুক্তি খাড়া করেছেন যার ভিত্তি মূলত নড়বড়ে। আমার প্রশ্ন, তারা কি নিশ্চিতভাবে আমাদেরকে বলতে রাজী আছেন যে, 'বিশ্বের কোনো শুরু ছিলো না' এ তথ্যটি মহাসত্য? যদি বলেন, তাহলে বিজ্ঞানীরা কেনো ভিন্ন কথা বলছেন? আর

তাদের লজিক কোথায়? লজিকের মাধ্যমে এটার প্রমাণ আমরা দেখতে চাই যে, জগতটা সর্বদাই এরূপ ছিলো যেরূপ এখনও আছে।]

৪. আমরা যদি এটা মেনেও নিই যে চেইন অব কজ [chain of cause] কোথাও শেষ হতে হবে, তাহলে যে জিনিস অ-কারণযুক্ত বা স্ব-কারণযুক্ত সেটা কেনো স্বয়ং মহাবিশ্বই হবে না? যদি স্ব-কারণযুক্ত ধারণা মেনে নিই তাহলে 'গড' তো 'redundant' [অর্থাৎ কর্মহীন] হয়ে পড়লেন! [**আমার কথা:** কী অদ্ভুত এক যুক্তি! এখন তারা কোনো উপায় না দেখে বলছেন, স্বয়ং প্রকৃতিই প্রভু [এর নামই প্রকৃতিপুঁজা]! কিন্তু তাদের এ উক্তি লজিক, প্রেমিজ, যুক্তি যেটাই বলি না কেন, কোনোটার সঙ্গেই খাপ খায় না। আমরা যেখানে প্রকৃতির কার্যকারণ নীতি ও সর্বশেষ কারণ তথা জগতের সৃষ্টি নিয়ে ভাবছি- সেখানে তারা নিছক প্রকৃতিপুঁজার কথা বলছেন। অন্ধত্ব আর কাকে বলে? বাস্তবে তারা যে দুর্ভেদ্য বৃত্তাকার দেওয়ালের চতুর্দিকে ডিগবাজী খাচ্ছেন তার আরেক প্রমাণ এটি। ফলে বেট্রান্ড রাসেল উপায়ন্তর না দেখে বলেছেন, "The universe is just there, and that's all. Betrand Russell, 1964"। এ বাক্যটি দ্বারা এটাই যেনো বৃটিশ দার্শনিক হতাশ হয়ে বলছেন, "বাবা! আর বলো না, প্লিজ। আমরা যেহেতু কজমোলজিকেল আর্গুমেন্টকে মানতে পারি না- কারণ আমরা নস্তিক, তাই বলছি, এ জগৎ [তা যেভাবেই অস্তিত্বশীল হোক না কেন] অস্থিত্বশীল হয়েছে, এই-যা, আর কিছু জানি না!" আসলে প্রভুবিশ্বাস, আগেই বলেছি 'গায়েবে বিশ্বাস' বৈ নয়। প্রভুর অস্তিত্ব জগতের অসংখ্য কার্যকারিতা, আশ্চর্য কুদরত ইত্যাদি দেখেও যারা দেখে না তারাই দুর্ভাগ্যশীল মানবগোষ্ঠি।]

৫. [**আমার কথা:** কজমোলজিকেল আর্গুমেন্ট মূলত ইয়াহুদী-খৃস্টবাদী দার্শনিকদের কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। উভয় গোষ্ঠি 'কিতাবী' ধর্মাবলম্বী হয়েও সে-ই শুরু থেকেই ওহীর জ্ঞান সম্বলিত তদের কিতাবদ্বয়ে [তাওরাত ও

ইঞ্জিলে] অনেক সংযোজন ও সংস্কার করে বসেন! ফলে উক্ত আর্গুমেন্ট ও এর ব্যাখ্যাদানে তারা খুব একটা শক্ত অবস্থানে যেতে পারেন নি। এরপরও জগৎ সৃষ্টির কারণ 'প্রভু'- এই আর্গুমেন্টের জবাবে পাল্টা অনেক যুক্তি সন্দেহবাদী ও নাস্তিকরা খাঁড়া করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সফল হন নি আজো। এখন আরেক কথা বলা হচ্ছে যে, এই আর্গুমেন্ট প্রভুর গুণাবলী সম্পর্কিত এটা কিংবা সেটা প্রমাণ করে না ইত্যাদি।] আমরা যদি এটা গ্রহণই করে নিই এই আর্গুমেন্ট কোনো একটা কিছু প্রমাণ করতে পেরেছে, তথাপি আমরা বলতে বাধ্য, গড যেসব গুণাবলীর অধিকারী হওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন থিসিস থেকে যা জানা যায়, তা এই আর্গুমেন্ট প্রমাণ করে না। যেমনঃ তিনি ক্ষমাশীল, দয়াবান ইত্যাদি। কজমোলজিকেল আর্গুমেন্ট থেকে যে 'গড' সম্পর্কে আমরা জানতে পারলাম, তিনি তো বেশ অদ্ভুত ও আত্মতৃপ্ত এক প্রভু। [**আমার কথাঃ** সমগ্র জগৎব্যাপী প্রভুর গুণাবলীর বিকাশ তারা দেখতে পান না- সুতরাং তাদের নিকট তো গড অদ্ভুতই মনে হবে। তারা তো নিজেদের দেহ-আত্মাকেও দেখতে অপারগ। তারা কিভাবে দেখবেন মহাবিশ্বের মহান প্রভুর গুণাবলীর বিকাশ? ঈমান না থাকলে যে [এসব ব্যাপারে] অন্ধত্ববরণ ছাড়া গত্যন্তর নেই- এই সত্যটি কি কখনো উপলব্ধি করবেন, সন্দেহবাদী ও নাস্তিক দার্শনিকগণ?]

অপর আরেক প্রশ্ন তারা করে থাকেন যা মূলত উপরোক্ত কথাগুলোই ঘুরেফিরে বলা ছাড়া আর কিছু নয়। তারা অবশ্য সে-ই বিতর্কিত 'লজিক' দ্বারা মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করেন। যেমন, "সবকিছুর কারণ যদি গড বা বিগ বেং হয় X [**আমার কথাঃ** দেখুন কি কৌশলে তারা বিগ বেংকে গড বানাচ্ছেন? বা গডের সমতূল্য বলছেন? আবারো প্রকৃতিপুঁজার পাঁয়তারা!] তাহলে আমরা সর্বদাই বলতে পারি, 'হ্যাঁ, কিন্তু X এর পেছনে কারণ কি? [X-কে সৃষ্টি করলো কে?]' আর এ প্রশ্নের জবাব যদি হয় Y [মানে আরেক গড] তাহলে কেউ পুনরায় জিজ্ঞেস করতে পারে, 'Y কোন

কারণে অস্তিত্বশীল হলো- তার অস্তিত্বের কারণ কি?' সুতরাং প্রশ্ন চলবে অনন্তকাল। যে একমাত্র উপায়ে এটি স্তব্ধ হতে পারে তাহলো, X, Y [বা Z] ইত্যাদি মূলত জাতে এরূপ ভিন্ন যে, প্রশ্নটি করাই যাবে না। এ থেকে এটাই মানতে হবে যে, কিছু অদ্ভুত গুণাবলী থাকতে হবে X এর। [**আমার কথাঃ** এখানে দার্শনিকরা আমাকে হতাশ করেছেন! X [যাকে গডের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে] এর গুণাবলীও তারা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করছেন! ধর্মবিশ্বাসের কথা হলো, গড ছিলেন, আছেন ও থাকবেন অনন্ত কাল। সুতরাং তাঁর মধ্যে যেসব গুণাবলী আছে তা-ও অসীম, তা-ই এগুলো মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করা যাবে না- কারণ মানুষ ও তার গুণাবলী সসীম। দার্শনিকদের এই ডিফেন্সও মূলত ভিত্তিহীন।]

চিন্তাখাদ্যঃ পশ্চিমা রেশনালিস্ট [সন্দেহাবাদী ও নাস্তিক] দার্শনিকদের উপরোক্ত ডিফেন্স কতটুকু গ্রহণযোগ্য [যদি তা হয়েই থাকে] বলে আপনি মনে করেন? আপনিও কি আমার সঙ্গে একমত, ধর্মবিশ্বাস ছাড়া প্রভু ও ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত আরো অনেক বিষয় যেমনঃ পরকাল, কবরের শাস্তি, শেষবিচার, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক যৌক্তিক ধারণাই সম্ভব নয়? মোটকথা, ধর্মসম্পর্কে দার্শনিকদের চিন্তা-চেতনা মূলত 'সূর্য নেই বলে বিশ্বাস রেখে, আবার এই সূর্যেরই সন্ধানে'র মতো নয় কি? যা নেই তা আবার খোঁজ করবো কেনো? শুধু নেই যে, তা-ই প্রমাণ করার চেষ্টা চালালেই হলো- এটাই কি দার্শনিকদের গবেষণা ধর্মদর্শন নিয়ে?

৬. ‘বিশ্বাস’ এবং ‘যুক্তিবাদ’: [**আমার কথা:** একজন পশ্চিমা দার্শনিক অবশেষে অপারগ হয়ে বিশ্বাস ও যুক্তিবাদ [faith and reason] যে মৌলিকভাবে দু‘টি ভিন্ন জিনিষ তা স্বীকার করেছেন। দার্শনিক বেন ডুপরি তার ‘50 philosophy ideas’ গ্রন্থে যা বলেছেন, তার [বঙ্গানূদিত] উদ্বৃতির কিয়দংশ এখানে তুলে ধরছি। তবে আগেই বলে রাখি তিনি সম্পূর্ণরূপে ধর্মবিশ্বাসী হন নি!]

আধুনিক যুগে বেশ কিছু ‘বীরত্বপূর্ণ’ চেষ্টা হয়েছে ‘গডের’ অস্তিত্বকে পুনঃপ্রমাণ করার। কিন্তু খুব একটা সফলতা লাভ হয় নি। অধিকাংশ [পশ্চিমা] দার্শনিক কিন্তু একমত হবেন, গডের অস্তিত্বের পক্ষে ট্রেডিশনাল আর্গুমেন্টগুলো পুনরুজ্জীবিত হবার নয়। তবে, অধিকাংশ ধর্মবিশ্বাসী মানুষ কিন্তু এই কক্লুশন দ্বারা মোটেই উদ্বিগ্ন নন। তাদের বিশ্বাস এরূপ কোনো আর্গুমেন্টের উপর নির্ভরশীল নয়। সুতরাং তারা অবশ্যই এগুলোর প্রতি দার্শনিকদের অনাস্থা দ্বারা মোটেই নড়বড়ে অবস্থানে যাবেন না।

তাদের বিশ্বাস, সাধারণ লজিক বা রেশনেল চিন্তা-ভাবনার স্ট্যান্ডার্ড ধর্মবিষয়ের সঙ্গে অসাঞ্জস্যশীল। বিমূর্ত দাশর্নিক ধারণা এবং যুক্তিবিদ্যার উপর নির্ভর ছিলো না তাদের ধর্মবিশ্বাসের মূল। আর এসব দার্শনিক গবেষণা তাদেরকে বিশ্বাসহীন করতে কোনো প্রভাবও ফেলবে না। তারা বরং দাবী করবে, এটা মূলত দৃষ্টতাপূর্ণ ধারণা যে, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক চেষ্টা দ্বারা প্রভুর কার্যাদি হয়ে যাবে আমাদের নিকট বোধশক্তিসম্পন্ন বা ট্রান্সপেরেন্ট। গডের উপর বিশ্বাস মূলেই যুক্তির সঙ্গে সম্পর্কহীন, তাতো আসলে “ঈমান” [faith] এর ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়।

বিশ্বাস [faith] হতে পারে অন্ধবিশ্বাস। কিন্তু এটা শুধুমাত্র ‘বিশ্বাসের’ ব্যাপার নয়। যারা বিশ্বাসকে যুক্তির ঊর্ধ্বে রাখেন তাদেরকে বলে

"ফাইডেইস্ট" [fideist]। তারা মনে করেন, বিশ্বাস হলো সত্যকে আবিষ্কারের বিকল্প রাস্তা। আর ধার্মিক বিশ্বাস হলো সঠিক পথ। এটা মূলত দৃঢ়তার একটি স্তর, যার মূল মানবাত্মার মাধ্যে স্বয়ং গড়ের ক্রিয়া। এরপরও প্রয়োজন হয় বিশ্বাসীর স্বেচ্ছাকৃত চেষ্টা-সাধনার; 'বিশ্বাস'কে উন্নততর করা প্রয়োজন, কিন্তু এই উন্নতিকরণ অন্ধকারের দিকে নয়। অপরদিকে দার্শনিকরা বিপরীতমুখী। তারা চেষ্টা করেন যৌক্তিক আর্গুমেন্ট বা তর্কের মাধ্যমে ধর্মবিশ্বাসকে সমর্থন করতে; তারা প্রমাণকে ওজন করেন যৌক্তিক দিক থেকে এবং সিন্ধান্তে পৌঁছেন এর উপর ভিত্তি করে। 'ফাইডেইস্ট' এবং 'ফিলোসফাররা' বিপরীতমুখী প্রজেক্টের সঙ্গে জড়িত বলে মনে হয়। তাদের মধ্যে দৃশ্যত কোন মিল নেই বা থাকলেও তা অত্যল্প। কোনো সম্ভাবনা আছে কি একে অন্যের সঙ্গে মিল বা মতৈক্যের?

বিশ্বাসের ব্যালান্স শিটঃ ধর্মবিশ্বাস যে রেশনেল দৃষ্টিকোণ থেকে সফলভাবে ডিফেন্ড করা মূলত সম্ভব নয়, এই সত্যটি ফাইডিলিস্টদের হাতে একটি ইতিবাচক পরামর্শে পরিণত হয়েছে। তারা বলেন, বিশ্বাসকে সত্যায়নের পূর্ণাঙ্গ যৌক্তিক রাস্তা যদি থাকতো- তাহলে, ফেইথের [ঈমানের] প্রয়োজন হতো না। রেশনালিস্টদের এই [যৌক্তিকভাবে প্রমাণের ব্যর্থতা থেকে] সৃষ্ট ফাঁকটুকু পূর্ণ করার উপায় হলো ফেইথ। বিশ্বাসীর পক্ষ থেকে যে ইচ্ছাক্রিয়া সক্রিয় হয়, তা-ই যোগান দেয় 'ঈমান লাভের' নৈতিক মূল্যবোধ; এবং বিশ্বাসীদের জন্য ধার্মিকতার কাঙ্ক্ষিত সুফল এক বিরাট অর্জন, যা হলো অতি সরল-সহজ এবং নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী হওয়া। ঈমানের কিছু কিছু আকর্ষণ সহজেই অনুমেয়ঃ জীবনের আছে সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য, জীবনচলার পথে যেসব পরীক্ষা-নীরিক্ষার সম্মুখীন হতে হয় তা থেকে প্রশান্তি লাভের উপায়, মৃত্যুর পরে উত্তম জীবনলাভের আশা ইত্যাদি, ইত্যাদি। ধার্মিক বিশ্বাস সুস্পষ্টভাবে যোগান ও সমাধান দেয় মানবের মৌলিক অনেক প্রয়োজন ও সমস্যার। অনেক মানুষ ধার্মিকতাকে গ্রহণ করে তাদের জীবন সফল এমনকি পরিবর্তন করে ধন্য

হয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে সত্য। একই সময় ধার্মিক কালচার ও মূল্যবোধ থেকে আমরা পেয়েছি শিল্পকলার প্রায় সীমাহীন প্রেরণা ও উৎকর্ষ।

ফাইডেইস্টদের অনেক পয়েন্ট যা তারা বিশ্বাসের ব্যালান্স শিটে ক্রেডিট সাইডে রাখেন, এথিইস্ট [atheist] বা অবিশ্বাসী দার্শনিকরা এগুলোকেই আবার ডেবিটের সাইডে নিয়ে যান! সেক্যুলার লিবারিজম [secular liberalism] - অর্থাৎ ধর্মনিরেপক্ষ উদারনীতি এর সর্বাপেক্ষা অমূল্য প্রিন্সিপালসমূহের অন্যতম মুক্তচিন্তা ও মতামতের স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন জে.এস. মিল [১৮০৬-১৮৭৩]।

কারো ধর্মবিশ্বাস অপরের উপর ন্যস্ত করা তখনই হবে প্রশংসনীয় যখন তারা নিজেরাও হবেন প্রশংসনীয়। যখন যুক্তিকে বন্ধ করা হবে, তখন সব ধরনের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি এসে এর স্থান দখল করে নেবে। আর এটা অস্বীকার করা কঠিন হবে যে, কোনো কোনো সময় কোনো কোনো ধর্মবিশ্বাসে বিবেক ও দয়া জানালা দিয়ে উড়ে যায়। সে শূন্যস্থান পূরণ করতে ঢুকে পড়ে সহিংসতা, আত্মকেন্দ্রিকতা ও আরো কতো জঘন্যতা।

সুতরাং, ব্যালান্স শিট প্রস্তুত হলো। উভয় দিকে আছে ডেভিট [ক্ষতি] ও ক্রেডিট [লাভ]। আর প্রায়শঃই একদিকের লাভ অন্যদিকে ক্ষতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এটাও হয়- উভয় দল হিসাব করেন ভিন্নভাবে, ফলাফল হয় অর্থহীন। আর যখন বিশ্বাসী-অবিশ্বাসীদের মধ্যে সংলাপ হয় তখন উক্তরূপ ফলাফলই পরিলক্ষিত হয়। তারা সাধারণত যারতার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার স্বার্থে কথা বলেন, মতৈক্যের মতো কোনো ব্যাপারে কোনো গ্রাউন্ডই তৈরী হয় না। তারা না পারেন সমর্থ হতে একে অন্যকে এক ইঞ্চি পরিমাণ নাড়াতে। এথিইস্টরা [নাস্তিকগণ] নিজেদের পরিতৃপ্তির জন্য উপস্থাপন করেন প্রমাণাদি, ধর্মবিশ্বাস অযৌক্তিক। অপরদিকে

ধর্মবিশ্বাসীরা এ ধরনের প্রমাণের তোয়াক্কা করেন না। কারণ, এগুলো এখানে অপ্রাসঙ্গিক ও মূলত আসল পয়েন্ট থেকে দূরে। সবশেষে, ফেইথ [ঈমান] হলো যুক্তিবিদ্যার বাইরে বা যুক্তির ঊর্ধ্বে; এটা গৌরব ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেকে যুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং বাস্তবে এটাই তার মূল পয়েন্ট।

আমার কথাঃ [পাঠকদের নিকট উপরোক্ত কথাগুলো কেমন লাগলো? আমার নিকট মনে হয়েছে, ধর্মবিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক হিসাবে জনসমক্ষে প্রচারের উদ্দেশ্যে একজন কট্টর নাস্তিকের সুকৌশল মাত্র এটি! তিনি খুব কৌশলে যুক্তিবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন- বা বলা যায় একে বৈধতা দান করতে চাচ্ছেন। এমনকি এটা অবিশ্বাসীদের জন্য সত্যান্বেষণের একমাত্র সঠিক রাস্তা বলেছেন। অপরদিকে ফেইথ বা ধর্মবিশ্বাস সম্পূর্ণ ব্যক্তির মনে ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল বলেছেন, যার ফলে এর গুরুত্বও তার নিকট তেমন কিছু নয়। আপনি বিশ্বাস করুন তো করুন, আমরা আস্তিকদের ব্যাপারে আপনার কোনো মতামত গ্রহণযোগ্য নয়! আমরাও সঠিক রাস্তায় আছি। কিন্তু আসলে নাস্তিকরা যে, পথহারা সেটা তো ঐ ফেইথই আমাদেরকে বলে দিচ্ছে। তিনি উভয়কে ব্যালান্স করছেন দু'টি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যা 'বিশ্বাসীরা' কখনো গ্রহণ করতে পারেন না- "ফেইথ অযৌক্তিক আর নাস্তিকতা যৌক্তিক" প্রকারান্তরে তিনি এ কথাই বলছেন। কিন্তু আমরা মনে করি ফেইথ যেমন যৌক্তিক তেমনি সত্যও। নাস্তিকতা যেমন অযৌক্তিক তেমনি ভ্রান্তও। পশ্চিমা এক ফেইথফুল হলি ব্যক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে প্রসঙ্গের ইতি টানছিঃ 'I believe, therefore I understand.' Saint Augustine of Hippo, c.400]।

কক্লুশন : আমার কথা

পশ্চিমা দর্শনের উপর এই সংক্ষিপ্ত তথ্যানুসন্ধান থেকে আমরা যাকিছু জানলাম তার সারাংশ এবার তুলে ধরছি। পাঠকরা নিজের বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা এসব পয়েন্ট বিবেচনা করে দেখবেন, আশাকরি। সকল ক্ষেত্রে হয়তো আমার সঙ্গে একমত না-ও হতে পারেন। এটা অবশ্য আমার নিকট 'অসহনশীল' কিছু নয়। আমিও একজন বিজ্ঞানের গবেষক ও লেখক হিসাবে 'মুক্তচিন্তার' উপর নির্ভরশীল। তবে আমি কখনো 'মুক্তচিন্তা' বা 'মুক্তবুদ্ধি' যা-ই বলুন না কেনো, আমার ধর্মবিশ্বাস বা ঈমানের জন্য এগুলো ক্ষতিকর বলে মনে করি না। তবে হ্যাঁ, আমি ধর্মবিশ্বাসের মৌলিক আক্বাঈদ যা পূর্ণাঙ্গভাবে ঐশীজ্ঞান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, এ সম্পর্কিত কোনো ব্যাপার মুক্তচিন্তা দ্বারা যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজনই বোধ করি না। এটা করার দরকার কী? এসব ব্যাপারে ঈমান রাখার নামই তো ধর্মবিশ্বাস বা আস্তিকতা। আর এসব ব্যাপারে সন্দেহপোষণ [যা না থাকলে তো যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণা আদৌ নিষ্প্রয়োজন] মানেই হলো ধর্মবিশ্বাসহীনতা বা নাস্তিকতা।

পশ্চিমা দর্শন দ্বারা আমার খুব একটা লাভ-ক্ষতি হয় নি। হ্যাঁ, জানলাম-বুঝলাম এই যা। এ থেকে কিন্তু একটা বিষয় স্পষ্ট হয়েছে, দর্শন এখনো কোন মহাসত্য আবিষ্কার করে নি- অবশ্য বিজ্ঞানও করে নি। অথচ উভয় বিষয়ই মনাবসমাজে প্রভাব বিস্তার করে আসছে। বিশেষ করে পশ্চিমা সমাজে দর্শনের ও বিজ্ঞানের প্রভাব সমানতালে বিস্তৃত। অপরদিকে প্রাচ্যের সমাজে ধর্মভিত্তিক দর্শন থেকে প্রভাব বিস্তার আগে থেকেই মুখ্য ছিলো আর এখন বিজ্ঞানের প্রভাবও দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। ধর্মবিশ্বাসের জন্য ক্ষতিকর কিছু দর্শনও আজ দুর্ভাগ্যবশত ঐতিহ্যবাহী প্রাচ্যের চরিত্রদর্শনে সমুন্নত সমাজে প্রভাব ফেলছে। এটা কতটুকু মারাত্মক হতে পারে তা ঐ আজকের পশ্চিমে নেচারেলিজম, সমকামিতা, বিবাহ-জীবনের ভাঙ্গণ, পারিবারিক মূল্যবোধের অবক্ষয়,

ড্রাগের চরম অপব্যবহার ইত্যাদি চারিত্রিক কুফল বিস্তারের দিকে ভালো করে তাকালে, যে কোন চিন্তাশীল মনে ধরা পড়বে।

সুতরাং, প্রাচ্যের 'পশ্চিমা দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট' মনীষীগণের চিন্তা করা উচিৎ, পশ্চিমা সকল দার্শনিক চিন্তা-চেতনা ধর্মবিশ্বাসী পূবালী সমাজে আমদানী সুফল বয়ে আনবে- না কি উল্টো সমাজের ঐতিহ্যবাহী চারিত্রিক মূল্যবোধ ও উত্তম নৈতিক চরিত্রকে ধ্বংস করে দেবে? ইতোমধ্যে সমাজে যে পরিবর্তন ঘটছে, তা কি মঙ্গলের না অমঙ্গলের দিকে ধাববান তা মুক্তমনে যাচাই করে দেখাও সময়ের দাবী। আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক বৈষয়িক উন্নয়ন যে, মূলত আমাদের ধর্মবিশ্বাসের সাথে সংঘাতময় নয় তা-ও সকলকে অনুধাবন করতে হবে। যারা বৈজ্ঞানিক উন্নয়নে ধর্মবিশ্বাস বাধা বলে মনে করেন, তাদের উচিৎ পুনরায় চিন্তা করা গভীরভাবে। নৈতিক চরিত্রগঠনের ইতিহাস তলিয়ে দেখলে আমরা বলতে বাধ্যঃ একমাত্র সঠিক ধর্মবিশ্বাসই মনুষকে দান করতে পারে সর্বাপেক্ষা উন্নত মানবিক নীতি-নৈতিকতা ও সুন্দর চরিত্র। দর্শন দ্বারা আমরা উপকৃত হতে পারি, দার্শনিকদের যুক্তিতর্ক শোনে। কিন্তু বাস্তব জীবনে নীতি-নৈতিকতার প্রতিফলন দর্শন থেকে যাই ঘটেছে তার দ্বারা মনাবজীবন চারিত্রিক দিক থেকে মারাত্মক অবক্ষয়ের শিকার হয়েছে। আর বিজ্ঞান তো এসব ব্যাপার থেকে স্বতন্ত্র বিষয়। যারা বিজ্ঞানচেতনা ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সংঘাতময় বলে মনে করেন, তারা ইয়াহুদী-খৃস্টবাদ ও বিজ্ঞানের সঙ্গে ঐতিহাসিক সংঘাতের ইতিহাস অধ্যয়ন থেকে প্রভাবান্বিত বৈ নন। সত্যধর্ম ইসলামের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনো সংঘাত কোনো দিন ছিলো না, এখন নয় এবং ভবিষ্যতে হবেও না।

একজন বিজ্ঞানের গবেষক হিসাবে আমি মৌলিকভাবে বিশ্বাস করি যে, মুসলিম ও অমুসলিম যে কোনো সমাজ ইসলামী জীবনবোধ ও নীতি-নৈতিকতা দ্বারা চরমভাবে উপকৃত হতে পারে। আর বৈষয়িক উন্নয়ন ও

জগতের সৃষ্টিশীলতা, পরিচলন ইত্যাদি ফিজিক্স সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের জন্য বিজ্ঞানকে হাতিয়ার বানাতে পারেন নির্দ্বিধায়। আমরা বিজ্ঞানী হয়েও প্রভুর আনুগত্যশীল বান্দায় পরিণত হতে পারি- এতে ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ ছাড়া কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই।

দার্শনিকরা নিজেরাই বিভিন্ন বিষয় মতানৈক্যের চরমে অবস্থান করছেন। এ প্রক্রিয়া সুদূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে বলেই মনে হয়। অন্তত, দর্শনের দীর্ঘদিনের ইতিহাস তাই প্রমাণ করে। সবেচেয়ে আশ্চর্য ও হতাশপূর্ণ যে আধুনিক ট্রেন্ড [trend] পশ্চিমা দর্শনে এখন পরিলক্ষিত হচ্ছে তাহলো, দার্শনিকরা বাস্তবে কী নিয়ে গবেষণা করছেন তা-ও এখন জানেন না! তাই তাদের অনেকে নতুন এক দর্শনের জন্ম দিয়েছেন যার কাজ হলো দর্শন কী তা বুঝা! অর্থাৎ দর্শনের দর্শন। একে ইংরেজিতে 'meta-philosophy' বা 'philosophy of philosophy' বলে। সে-ই আড়াই হাজার বছর আগে থেকে কতো 'চিন্তাশীল' মনীষী জীবন কাটালেন, জেল-যুলুম-অত্যাচার সহ্য করলেন, এমনকি কেউ কেউ প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিলেন এমন এক বিষয়ের উপর গবেষণা করে, যার সঠিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আজো জানা হয় নি! কী বিরাট এক অবিশ্বাস্য কথা! কিন্তু পশ্চিমা দার্শনিকরা এখন তা-ই মনে করছেন। শত শত বাদ-মতবাদ, সবই বুঝি বিফলে গেলো?

এ ক্ষুদ্র গ্রন্থের পৃষ্ঠাসমূহে পশ্চিমা দর্শনের স্বরূপ খুব সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরার চেষ্টা চালিয়েছি। এসব দার্শনিক চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে ব্যক্তিগত ধারণা ইতোমধ্যে ব্যক্ত করলাম। এগুলো ধর্মবিশ্বাসী সর্বসাধারণের জন্য কতটুকু উপাকারী বা না, তার বিচার পাঠক হিসাবে আপনাদের উপরই আমি ছেড়ে দিলাম।